

নারায়ণ সান্যাল

সুতনুকা

কোন দেবদাসীর নাম নয়



কৈফিয়ৎ

“সেবদাসী’-প্রথা বর্তমানে নেই—অস্তিত্ব খাতা-কলমে। আইনের সাহায্যে মন্দির কারাগার থেকে তাদের মুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের আন্দোলনে সহস্রকের এই কু-প্রথাটি বর্তমান শতাব্দীতে আইন-মোতাবেক নিবিদ্ধ হয়েছে। সেদিন সারা ভারতে সে কী উল্লাস। আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ছোট-খাটো সংস্করণ যেন। ভারতকে স্বাধীন করার যেমন জবাহরলালকে ‘ভারতবর্ষ’ উপাধিতে বিভূষিত করা হয়েছিল, এই ক্ষুদ্রতর স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল নায়িকা মিসেস মুখুলক্ষ্মী রেড্ডীকে তেমনি ‘পদ্মভূষণ’ খেতাব দেওয়া হয়েছিল। সে সম্মান তাঁর প্রাপ্য।

“কিন্তু।

“ভারত স্বাধীন হওয়ার গোটা দেশটা যেমন মুক্তির স্বাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিল—অন্নবস্ত্র-শিক্ষা-নিরাপত্তার অভাব যেমন আমরা আজ অনুভব করি না, মন্দিরের চার-দেওয়ালের রক্ত কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ঐ সেবদাসীরাও কি তেমনিভাবে সব কিছু ফিরে পেল?

—“সম্মান, মর্যাদা? স্বামী-সংসার-সঙ্কান?”

—এ পর্যন্ত যা লিখেছি তা উদ্ধৃতিমাত্র। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ‘সূতনুকা একটি সেবদাসীর নাম’ গ্রন্থের ‘কৈফিয়ৎ’ থেকে। সে-গ্রন্থে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—মুক্ত সেবদাসীদের সঙ্কান পেলে আপনাদের জানানো। বর্তমান গ্রন্থটি সেই প্রতিশ্রুতি থেকে আমার দায়মুক্ত হওয়ার প্রয়াস। পূর্ববর্তী-গ্রন্থের অংশবিশেষ অবলম্বনে ‘সূতনুকা’ নামে একটি বেতারনাট্য প্রচারিত হওয়ায় নামটা এখন আর একটু পরিচিত। পরে ‘সেবদাসী সূতনুকা’ নাটক আকারে কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এ-গ্রন্থ অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। বলা-বাহুল্য—দুটি গ্রন্থ বাগধর্মের মত সম্পৃক্ত।

ডক্টর মিসেস মুখুলক্ষ্মী রেড্ডি ব্যতিরেকে এ কাহিনীর প্রতিটি চরিত্র কাল্পনিক, যদিও ইতিহাসকে আমি জ্ঞানত কোথাও অতিক্রম করিনি।

নারায়ণ সান্যাল

চৈত্র শেব, ১৩/৪/৮৫



খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ বসেছিল ও।

শীত শেষ হয়েছে। ঝরাপাতার মরশুম। দখিনা বাতাস বইছে। জানলার সামনে চার্চের বাগিচা। মরশুমি ফুলের কেয়ারি। ডায়াহুস, ম্লান, পপি, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া। ফুল ফুটতে শুরু করেনি, নতুন পাতা মেলে শিশু-তরু অবাধ বিস্ময়ে দেখছে এই আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীকে। লাল কাঁকরের পথটা শেষ হয়েছে গেটে। পাশেই দারোয়ানের কুটুরি, তার পাশে খানদানি অ্যালসেশিয়ান জ্যাক্-এর কেনেল। পাঁচিলঘেরা চার্চের চৌহদ্দির বাহিরে পিচমোড়া

রাজপথের এক-চিলতে একটা খণ্ডাংশ ধরা পড়েছে জানলার ফ্রেমে। তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় নানান চক্রবানের যাওয়া আসা—ক্রতগামী বাস, বিচক্রবান, মহুরগতি গোযান। ওরা একদিক দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করছে, অন্যদিক দিয়ে প্রস্থান করছে। জানলার ঐ সীমাবদ্ধ চৌহদ্দিতে থেমে থাকতে কেউ আসেনি। এই চলমান জীবনছন্দের দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু ও সে সব কিছুই দেখছে না।

ডুবে আছে অন্তর্লীন স্মৃতিচারণে।

এ পাশের খাটে খোকন ঘুমোচ্ছে। নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায়।

ওর দেড় বছরের বাচ্চা।

সামনে টেবিলের উপর খোলা-অবস্থায় পড়ে আছে চিঠিখানা। না-হোক দশবার পড়েছে সেটা। প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন ওর একটা জবাব লেখা। কলম আর চিঠি-লেখার প্যাডটা নিয়ে বসেছে তাই, খোকনকে ঘুম পাড়িয়ে। কিন্তু কী লিখবে?

মাদারকে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি কিন্তু স্পষ্ট কোনও জবাব দেননি। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আবাল্য তিনি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়ে এসেছেন—এটা ক'র, ওটা ক'র না। অথচ এবার? এবার তিনি বললেন, জীবনে এমন একটা পর্যায় আসে, যখন নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হয়। নিজের অন্তরকে প্রশ্ন কর। যীসাস্-এর উপর আস্থা রাখ। তিনিই তোমাকে পথনির্দেশ দেবেন। তারপর অচঞ্চল-চিন্তে ওকে জানিয়ে দাও তোমার স্থির সিদ্ধান্ত। নিজের ক্রুশ নিজেকেই বইতে হয়, সু।

সু। হ্যাঁ, পুরো নাম ধরে মাদার ওকে ডাকেন না। ডাকেননি কোনদিন। সেই পাঁচ-বছরের বালিকা বয়স থেকে এই বাইশ বছরের তরুণীকে কোনদিন 'সুতনুকা' নামে

ডাকেননি মাদাম অ্যাঞ্জেলিকা।

কিন্তু ‘নিজের ক্রুশ নিজেকেই বইতে হয়’—বললেন কেন? ঐ নির্দেশের ভিতরেই কি তিনি তির্যক ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন? বাপ-পিতামহর ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে সে যীসাস্-এর ভজনা করুক? না। স্পষ্টাক্ষরে তিনি তা বলেননি। ওর মায়ের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ সিদ্ধান্তটা ‘সু’-র নিজেরই। একান্তই নিজস্ব। কেন নেবে না? হিন্দু ধর্ম ওকে কী দিয়েছে? অসম্মান, গ্লানি, নির্যাতন, আর চরম সর্বনাশ। দৈহিক ও মানসিক। মাত্র বাইশ বছরের মধ্যে তাকে বীতশ্রদ্ধ, বিমুখ করে তুলেছে জীবনের প্রতি। এই গলিত, কুপমণ্ডুক সনাতনধর্মের আধুনিক নাগপাশ থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছাটা তার নিজেরই। একমাত্র আশঙ্কা ছিল—‘ও’ রাজী হবে কি না।

তা সে জবাবটাও তো এসে গেল। ঐ কটা পংক্তির উপর চোখ বুলিয়ে নিল আবার:

“আমি মনে করি তুমি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছ। এ ছাড়া তোমার মুক্তি নেই। আমিও এতদিনে নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছি। এই কুপমণ্ডুক হিন্দুসমাজকে আর কোনদিনই তার সুমহান প্রাচীন ঐতিহ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। আমিও স্থির করেছি খ্রীস্টান হয়ে যাব। মাদারের ব্যবস্থাপনায় আমরা দুজনে ঐ ব্যাপ্টিস্ট চার্চেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব। তোমাকে আগেই বলেছি, পিতৃপরিচয়হীন খোকন আমারই সন্তানরূপে পরিচিত হবে দুনিয়ায়। জানি, আমার পিতৃদেব প্রচণ্ড আঘাত পাবেন—তুমি তাঁকে দেখনি, কিন্তু আমার কাছে জেনেছ—তিনি কটর হিন্দু। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান এবং মাতৃহীন। ফলে শেষজীবনে তাঁকে একটা মর্মান্তিক আঘাত দিতে বাধ্য হব আমি। উপায় নেই। এটাই বোধহয় নিয়তির বিধান। আমার বাবা তোমাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে কিছুতেই স্বীকৃত হবেন না। না, তুমি খ্রিস্টিয়ান বলে নয়, তুমি প্রাক্তন দেবদাসী বলে। তার চেয়েও বড় কারণ : খোকন!....”

সুতনুকা দু-হাতে মুখটা ঢাকল। রগের শিরা দুটি দপদপ করছে। দু-হাতে কপাল টিপে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঐ পত্রখানাকেই সম্বোধন করে আপনমনে বলে উঠল—

“হোয়াট্‌স্‌ হেকুবা টু হিম, অর হি টু হেকুবা?”

মাদার অ্যাঞ্জেলিকার কাছে ইংরেজিটা সে ভালই শিখেছে। চিঠির ঐ অংশটা পড়ে তাই ওর মনে পড়ে গেল হ্যামলেটের স্বগতোক্তি!

মনে পড়ে যাচ্ছে গতকাল সন্ধ্যার মর্মান্তিক ঘটনাটা। এই চার্চের ভিতরেই! যে ঘটনায় ওর সাত-মহলা প্রাসাদ মুহূর্তে ধূলিসাৎ হল। কিন্তু নাঃ। সেকথা নয়। সেকথা চিন্তা করার সময় এখনও আসেনি। আগে চিঠির জবাবটা লিখতে হবে। ‘দেব’ তার জীবনের ভোগে তার ‘সু’-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। খোকনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জীবন—যে জীবন আবাল্য মুখ ফিরিয়ে পিছন-ফিরে বসেছিল—

সেই জীবন ওকে হাতছানি দিয়েছে। পাঠিয়েছে তার সবুজ আমন্ত্রণ-লিপি। হাত বাড়িয়ে দেবে না ও ? সহস্রাব্দি ধরে দেবদাসীরা যা চেয়েছে অথচ কোনদিন পায়নি, তাই ওকে পেতে হবে ; অঞ্জলিভরে আকর্ষণ পান করতে হবে অমৃত-রস : ঐ লক্ষ লক্ষ হতভাগিনীদের প্রতিনিধি হিসাবে!

স্বামী-সন্তান-সংসার। নারীর মর্যাদা!

মনে পড়ছে—কত কথা। কত, কত, কত পুরানো দিনের কথা।

বাপকে হারিয়েছিল মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। আবছা মনে পড়ে তাঁর মুখখানা। মা, লক্ষ্মী-আম্মা একমাত্র সন্তানটিকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ওর কাকা থিরুমলের ডেরাতে। কাকা নিঃসন্তান এবং কাকী খাওয়ারনী। আশ্রয় দিতে আপত্তি হয়নি ওদের, বরং আগ্রহই দেখা গিয়েছিল। হবে না কেন ? ওর বাপের সাত বিঘে বর্গা-বন্দোবস্তের জমি, একজোড়া বলদ, একটা গাইগরু এল ওদের হাতে। দ্বিতীয়ত, পেট-চুক্তি একটা ঝি পাওয়া গেল বাড়িতে। রান্না করা, ক্ষার কাছা, গরুর সেবা থেকে যাবতীয় কাজ নিরলস নিষ্ঠায় করে যেত সদ্যবিধবা। আর তার পাঁচ বছরের মেয়েটা দিনরাত টুকিটাকি ফাইফরমাস খাটত হাতে-হাতে। ঘর-দোর ঝাড়-পৌছ করা, কাকার জন্য তামাক আর কাকীর জন্য পান সাজা, গোবরের তাল কুড়িয়ে ঘুঁটে দেওয়া। ওর মা কিন্তু একটা কাজ করেছিল, দেবর-ভাজের প্রকল আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছিল মেয়েকে। সেখানেই একদিন ও দেখা পেল মাদারের। ওদের গ্রামে ছিল একটা প্যারিশ-চার্চ। তাদের উদ্যোগেই ঐ পাঠশালাটা চলে। গরিব-গুরুবোদের মধ্যে সেবা-ধর্মের কাজ করতে ঐ গণগ্রামে এসেছিলেন খ্রীস্টান সেবাত্রীরা। কেন্দ্রীয় অফিস মাদ্রাজে। জন ক্যালভিনের মতাবলম্বী ক্যালভিনিস্ট চার্চ সম্প্রদায়। প্রটেস্ট্যান্ট। ওরা সংক্ষেপে বলত ব্যাপ্টিস্ট চার্চ। সেই কেন্দ্রীয় চার্চ থেকে পরিদর্শনে এসেছিলেন মাদার অ্যাঞ্জেলিকা। সূতনুকায়ে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। যেন ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকোর আঁকা অ্যাঞ্জেল। তেমনি নিষ্পাপ অনিন্দ্যকান্তি, যেমন বুদ্ধি তেমন ব্যবহার। মেয়েটিকে তিনি গ্রহণ করতে চাইলেন। তার সব দায়-ঝক্কি, ভরণপোষণ, শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন তিনি। থিরুমল তো তাঁকে মারতে বাকি রাখল। মাও—কি-জানি-কেন—রাজী হ'ল না। মেয়ে শেষমেশ খেঁটান হয়ে যাবে। মা-গো।

কিন্তু আরও দু'বছর পরে সেই সিদ্ধান্তই নিতে হল লক্ষ্মী-আম্মাকে। যখন বুঝল—ওর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে সে মরতে বসেছে। দেবর থিরুমলের চেয়ে অনাখ্যীয় মাদারকেই নির্ভরযোগ্য মনে হল তার। অনাথ মেয়েটিকে তাঁর চরণেই সঁপে দিল। কিন্তু একটি মাত্র শর্তে : মেয়ে যেন শেষমেশ খেঁটান না হয়ে যায়।

ধিক্রমল এবারও বাধা দিতে এসেছিল। কিন্তু সেটা ধোপে টিকল না। গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাতব্বরেরা বিধান দিলেন : নাবালিকা সূতনুকার অভিভাবক তার কাকা নয়, তার মৃত্যুপথযাত্রিণী জননী।

সূতনুকা এল শহরে। মহারাষ্ট্রের গণগ্রাম থেকে মাদ্রাজে। চার্চের ব্যবস্থাপনায় সেখানে ইতিপূর্বেই গড়ে উঠেছিল একটি অনাথ আশ্রম। আশ্চর্য! সেখানে যারা আশ্রয় পেয়েছে তারা খ্রীষ্টান নয়, হিন্দু। চার্চ তাদের খাওয়ায়, পরায়, নানান অর্থকরী বিদ্যায় স্বয়ম্ভরা হতে শেখায়। কেউ শেখে সেলাই, কেউ বোনার কাজ, কেউ শিক্ষকতা, কেউ বা নার্সিং। তারা সবাই অনাথা—স্বামীতাস্তা, সমাজতাস্তা অথবা পিতৃ-মাতৃহীনা। সাবালিকা হবার পর যদি তারা স্বৈচ্ছায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে চায় তখন কী সমাজ, কী আদালত কারও বাধা দেবার এস্তিয়ার নেই।

সূতনুকা যখন আশ্রমে এল তখন ওর বয়স সাত। ভর্তি হল ইংরেজি স্কুলে। আবাসিক মেয়েরা কিছু তামিলভাষী, কিছু তেলেগু—ফলে সে দুটি ভাষাও শিখে গেল। মায়ের মৃত্যুশোক ভুলল—বোধকরি নতুন এক মাকে খুঁজে পেল বলে : মাদার।

আশ্রমে ওরা সমবেত প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইত। কিছু ব্রাহ্মসঙ্গীতের অনুবাদ, কিছু বা বিশেষভাবে লেখানো ধর্মসঙ্গীত—ইংরাজীতে, তামিলে, তেলেগুতে—যাতে আছে পরমেশ্বরের জয়গান, ভারতবর্ষের একাত্মতার কথা। মানুষের জয়গান। নাই শিব-বিষ্ণু বা গণপতির উল্লেখ। এমন কি নাই মেরী যীসাস্ বা খ্রীষ্টান সাধুসন্তদের প্রসঙ্গ। ফাদার এম্‌হার্স্ট এই ব্যবস্থাটি করে গেছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে। তিনি ছিলেন সতাই মানব দরদী। অনাথা ও সমাজতাস্তা হিন্দু হতভাগিনীদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন—কটর হিন্দু সমাজের তরফ থেকে বাধা আসবেই, যদি এই মেয়েদের খ্রীষ্টান করতে চান। তবু দু-একজন কটর হিন্দু সমাজপতি দু-একবার মামলা-মোকদ্দমা যে না করেছেন তা নয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই চার্চ সসম্মানে বিজয়ী হয়েছে। সমাজ-পরিত্যক্তাদের, অনাথাদের এভাবে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে কোন্-না বিচারক সায় দেবেন? কোনও ধর্মান্ধ হিন্দু বিচারক ও-পক্ষে রায় দিলেও আপীলে চার্চ জিতেছে। কারণ সেই ইংরেজ আমলে ঊর্ধ্বতম মহলে বিচারকেরা ছিলেন অব্যতিক্রম সাদা চামড়ার।

সূতনুকাই একমাত্র ব্যতিক্রম।

তার বয়স যখন আঠারো তখন ওর জীবনে ঘনিয়ে এল এক ক্রান্তিকাল।

ধিক্রমল এসে দাবী করল তার ব্রাতৃপুত্রীকে। সেই এখন আইনসঙ্গত ভাবে সূতনুকার অভিভাবক। সূতনুকা দৃঢ় প্রতিবাদ জানালো। এই আঠারো বছরের ভিতর সে অনেক-অনেক কিছু জেনেছে, বুঝেছে, দেখেছে। পশ্চিমের জ্ঞানলা খুলে গেছে তার দৃষ্টিপথে। মিল-বেহাম-ডেকার্টে। শেকস্পীয়র-মিশ্টন-ডিকেন্স। অনাথ-আশ্রমের নিশ্চিন্ত দেবদাসী ৪

নিরাপত্তা ত্যাগ করে সেই গণ্ডগ্রামের সংকীর্ণ বাতাবরণে ফিরে যেতে সে আসৌ প্রস্তুত নয়। কিন্তু থিরুমল তো তাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেনি। সে যে এসেছে দেবতার নির্দেশে! এসেছে ধর্মের ডাকে!

নিঃসন্তান থিরুমল প্রায় পঞ্চাশের কোঠায়। সে নাকি গিয়ে ধর্না দিয়েছিল দেবী ইয়েলাম্মার মন্দিরে। বংশ লোপ হতে বসেছে তাদের। পুত্রসন্তান কামনায় সে ‘হত্যা’ দিল মন্দিরে। তিনদিন-চার রাত নিরন্তর উপবাস করে পড়ে রইল পাষাণচত্বরে—সাঁটান-প্রণতির ভঙ্গিমাতে। কী কঠিন সে ব্রত! তারপর চতুর্থ রাত্রির শেষধামে দেবী ইয়েলাম্মা তাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন—একটি সুলক্ষণা অক্ষতযোনি কুমারী কন্যাকে যদি সে দেবীমন্দিরে দেবদাসীরূপে উৎসর্গ করতে পারে, তবেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তবেই তার স্ত্রীর গর্ভে আসবে সর্বগুণাভিতা এক পুত্রসন্তান। থিরুমল গরীব মানুষ—দেবদাসী কন্যা সে কিনবে কোথায়? মাতঙ্গী বা আঠানী সম্প্রদায়ের ভিক্ষাজীবী পরিবারে অবশ্য অমন কুমারী কন্যা কিনতে পাওয়া যায়—কিন্তু চার-পাঁচ কুড়ি টাকা লাগবেই। তখনই তার মনে পড়ে গেল ভাইঝিটার কথা। বাপখাগী-মাখাগী মেয়েটা বছর দশেক হল পড়ে আছে মাদ্রাজের অনাথ-আশ্রমে। এতদিনে সে ডাগর হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই, যদিও থিরুমল তার ষোড়শবর নয়নি কোনদিন। হিসাব মতো আঠারো বছর বয়স হল তার। কী জানি কোনদিন তাকে সেই খেঁটান-মাগী খেঁটান করে দেয়। থিরুমল তার আর্জিটা পেশ করল গ্রাম-পঞ্চায়েতে। অনেক বিচার বিবেচনা করে মাতব্বরেরা বিধান দিলেন—থিরুমল যখন দেবীর প্রত্যাশে পেয়েছে তখন আর দ্বিধা করার কিছু নেই। মেয়েটাকে খেঁটান হয়ে যেতে দেওয়া যায় না। থিরুমল চলে যাক মাদ্রাজে। নিয়ে আসুক তার ভাইঝিকে। মহাজাগ্রতা দেবী ইয়েলাম্মার মন্দিরে তাকে ‘উচ্ছুণ্ড’ করে দিক। বাপমা-খাগী মেয়েটা সাতজন্মের পাপ থেকে উদ্ধার পাক, আর ঐ থিরুমলেরও বংশরক্ষা হক।

তবু থিরুমলের সাহস হয় না। মাদ্রাজ হচ্ছে শহর-গঞ্জ এলাকা। দূরও যথেষ্ট। সেটা সাহেবদের রাজত্ব। ও যদি কোনক্রমে সেখানে যায়ও তবু কেমন ক’রে ছিনিয়ে আনবে তার ভাইঝিটাকে?

সব কথা শুনে মদত দিতে এগিয়ে এল ইয়েলাম্মা মন্দিরের প্রধান সেবায়োত বৃদ্ধ সহস্রাক্ষ। বললে, খরচপত্র তোকে করতে হবে না। মায়ের কাজ! খরচপাতি সব আমার। তুই শুধু সঙ্গে চল। মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট গণেশন হচ্ছে মন্দিরের অ্যাটর্নি। তাকে লাগিয়ে দেব। ‘পিতা-পিতা’ বলতে বলতে মেয়েটাকে ছেড়ে দেবে ওরা।

যে-কথা সেই কাজ। সদলবলে এসেছিল ওরা। সূতনুকার পূজাপাদ পিতৃবা থিরুমল, ইয়েলাম্মা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সন্তর বছরের বৃদ্ধ সহস্রাক্ষ, আর মাদ্রাজের স্বনামখ্যাত চৌখন্স উকিল গণেশন। মাদার অস্বীকার করলেন সূতনুকারে প্রত্যার্ণণ করতে। বেধে গেল মামলা। ছয় মাস ধরে সে মামলা চলল। নানান যুক্তিতর্ক—নানান

দেবদাসী ৫

সওয়াল-জবাব। সারদা আইনের সাহায্য পাওয়া গেল না। সূতনুকা নাবালিকা নয়। গণেশনের আর্জি-মোতাবেক বিচারপতির ব্যবস্থাপনায় লেডি-ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করে এজাহার দিলেন সূতনুকার বয়স আঠারো। মাদারের বক্তব্য—সাত বছর বয়সে মেয়েটির মা তাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর এগারো বছর ধরে মেয়েটির কোনও সন্ধান কেউ নেয়নি। তিনিই তাকে লালন-পালন করেছেন। স্কুল-কলেজে পড়িয়েছেন। এ বছর সে আই. এ. পরীক্ষা সসম্মানে পাশ করেছে। মেয়েটিকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করুন ধর্মাধিকরণ। মাদারই তার একমাত্র অভিভাবক। বিক্রমলের পক্ষে উকিলের বক্তব্য—মা-বাপের অবর্তমানে মেয়েটির পিতৃব্যই তার আইনসম্মত অভিভাবক। বিক্রমল নিরঙ্কর, তাই সে এতদিন চিঠিপত্র লেখেনি বা খোঁজ-খবর নেয়নি। তার ভাইঝি এখন প্রাপ্তবয়স্ক। তাই সে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

সূতনুকা কী চায় তা কেউ জানতে চাইল না।

অনেক বিচার-বিকেনা করে ধর্মাধিকরণ রায় দিলেন : সূতনুকার অভিভাবক হচ্ছে তার খুঁজতাত বিক্রমল। অনাথ-আশ্রম বা চার্চ আইনের ভাষায় ছিল অছিমাত্র। সূতরাং সূতনুকাকে প্রত্যর্পণ করতে হবে বিক্রমলের জিম্মায়। আর তারপর—প্রতিবাদীর কাউন্সেল যে আশঙ্কার কথা বলেছেন, বিক্রমল মেয়েটিকে দেবদাসী করে দেবে—সে বিষয়ে আদালতের বক্তব্য : সেটাও আইনসম্মত। যেহেতু সূতনুকানাবালিকানয় তাই সারদা-আইনের আওতায় আসে না।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আশ্রম ত্যাগ করে যাবার জন্য প্রস্তুত হল সূতনুকা।

কিন্তু মাদার পরাজয় মেনে নিতে প্রস্তুত নন। বললেন, না! এ হতে পারে না! সুকিচর কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবেই। আপীল করব আমি।

আপীল কিন্তু শেষপর্যন্ত করা যায়নি। কার্ল মাস্ট্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি—বাঁটি ইংরাজ তিনি, চীফ জাস্টিস অনারেবল্ মিস্টার জনসন—বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত মাদার। জাস্টিস্ প্যাটেলের রায়টা আমি পূর্নানুপূর্ণভাবে পরীক্ষা করেছি। একেবারে নিশ্চয়। নীরঙ্ক। আপীলে জিতবার কোনও আশা নেই।

—মেয়েটিকে বাঁচানো যাবে না তাহলে?—যেন আর্তনাদ করলেন মাদার।

চীফ-জাস্টিস্ দুঃখিতভাবে মাথাটা নেড়ে বললেন, আরাম সরি! না, এখন দেশের যা আইন তাতে কিছুই করা সম্ভবপর নয়। একুশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা নাবালিকা, অভিভাবকের ইচ্ছানুযীন, এবং আঠারো বছর বয়সের আগে তাকে দেবদাসী-হিসাবে উৎসর্গ করা যায় না, সারদা-আইন অনুসারে। দুর্ভাগ্যক্রমে সূতনুকা না আঠারোর কম, না একুশের বেশি।

—একে আপনারা বিচার বলেন? এই অবিচারকে?

দ্বিভ হেসে চীফ-জাস্টিস্ বলেন, শুধু একে নয়, মাদার। দু হাজার বছর আগে দেবদাসী ৬

পল্লিগ্রাস পিলেতের আদালতের রায়টাকেও আমরা 'বিচার'ই বলি! এবং তারও আগে হেমলক-পানে বাধা হয়েছিলেন এমন এক আসামীর বিচারকে।

—কোনও আশা কি নেই?

—আপাতত নেই। অন্তত এ মেয়েটির ক্ষেত্রে নেই। যদি কোনদিন ডক্টর রেড্ডির প্রস্তাবটা গৃহীত হয়, আইনে পরিণত হয়, তখন হয়তো সে-যুগের সূতনুকারা নিস্তার পাবে।

—ডক্টর রেড্ডি কে?

—ডক্টর মিসেস মুখলক্ষ্মী রেড্ডি। একজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, সমাজ সেবিকা এবং কাউন্সিলার। দেবদাসী-প্রথা রদ করার জন্য দু-তিন দশক আগে তিনি মাদ্রাজ বিধান পরিষদে একটি বিল এনেছিলেন—উনিশ শ' সাতাশে। তৃতীয় কাউন্সিলের দ্বিতীয় সভায়। তারিখটাও মনে আছে আমার—শুক্রবার, চোঠা নভেম্বর। তারপর এই পৃথিবী বিশ-পঁচিশবার সূর্য-প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করেছে, তবু এই নেটিভ নিগারগুলো বিলটাকে আইনে পরিণত হতে দেয়নি। মিস্ মেয়ো মিছে কথা লেখেননি, মাদার—যতই কেননা প্রতিবাদ করুন টেগোর আর গ্যান্ডি—এই হিন্দু সমাজটার এখন রক্তে রক্তে বিষ।

মাদার হেসে বলেছিলেন, আয়্যাম সরি অনব্রেক্‌চীফ জাস্টিস্, স্যার! আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আমিও আজ চল্লিশ বছর ধরে ঐ হিন্দু সমাজের ভিতর গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ করছি। আমি তো ওদের অন্তরে বিষের সন্ধান পাই না।

জনসনও তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, আয়্যাম অলসো ইকোয়ালি সরি, অনব্রেক্‌ মাদার! আমিও আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আমিও আজ চল্লিশ বছর ধরে ভারতবর্ষের সেবা করছি—গ্রামে নয়, শহর গঞ্জে, জুডিশিয়ারিতে। বাই দ্য ওয়ে—এ মামলাটা লড়তে চার্চের তহবিল থেকে কত খরচ পড়েছে আপনার?

—খাতাপত্র না দেখে ঠিক বলতে পারছি না। হাজারের উপর। কেন বলুন তো?

—ফর ইয়োর ইন্কোরমেশন, মাদার : বাদীপক্ষের উকিল গণেশন মাত্র চার টাকা রিটেইনার কি ছাড়া আর এক পয়সাও নেয়নি। বিশ্বাস করতে পারেন?

মাদার অবাক হয়ে বলেন, আশ্চর্য! কিনা ফি-তে গণেশন এতবার আপিয়ার হয়েছে?

—আমার তো তাই খবর। ষিক্রমল আর সহ্যাক তাকে অন্যভাবে 'ফি'-টা মিটিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত।

—অন্য ভাবে। মানে?

—সে আর আপনার শুনে কাজ নেই, মাদার। গ্রাম-অমৃত নিয়েই তৃপ্ত আছেন, শহরে হলাহলের সন্ধান নাই বা করলেন।

মাদার সতাই বুঝে উঠতে পারেননি এ ধাঁধাটার কী অর্থ। আজন্ম ব্রহ্মচারিণী

দেবদাসী ৭

সেবাত্রতার কল্পনাতেই আসেনি সেটা। ভেবেছিলেন। কিন্তু কুলকিনারা পাননি। গণেশন কেন দিনের পর দিন এভাবে লড়ে গেছে? রোখ চেপে গিয়েছিল বলে? প্রেস্টিজ-ইসু? ‘মাদ্রাজ বারে’ তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে? মাদার জানেন না।

জানে সূতনুকা। মাদারকে সে-কথা সে মুখ ফুটে বলেনি কোনদিন। সে কথা কি বলা যায়? মামলা জয়ের পর প্রতিশ্রুতি মতো সহস্রাঙ্ক উকিলবাবুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ছুটির সাতটা দিন মন্দিরের অতিথি হতে। গণেশন ইয়েলান্মা-মন্দিরের অতিথিশালায় সাতটা দিন কাটিয়ে আসে। এবং সাতটা রাত। তার সেই সাতটা রাতে পর্যায়ক্রমে তার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল ইয়েলান্মা-মন্দিরের সাত-সাতজন সেবাদাসী। চম্পা, মেনকা, রাধা, রুগ্মিলীবাসি, সত্যভামা, বাসবী—আর হ্যাঁ, উৎসবের শেখরায়ে একাদশবর্ষীয়া এককোঁটা ঐ মেয়েটা—পূম্পা।

পরে একদিন অক্ষসিক্ত পূম্পা সূতনুকার বুকের উপত্যকায় মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ব্যক্ত করেছিল তার লজ্জার কথা, যন্ত্রণার কথা। মানসিক শুধু নয়, দৈহিক। হাসপাতালে গিয়ে সিট্ নিতে হয়েছিল তাকে। ভিজা গামছা খেভাবে নিষ্চড়ানো হয়, ঠিক সেভাবেই ঐ এককোঁটা মেয়েটার সেহ নিষ্চড়ে শেষ মধুকিন্দুটি পর্যন্ত নিষ্কাশন করেছিল দানবটা।

না। সূতনুকার সম্মুখীন হবার সাহস সে সম্বন্ধ করতে পারেনি। সহস্রাঙ্কনে বলেছিল, ও বাড়িনী। ওকে বল করার হিম্মৎ আমার নেই। বিশেষ ও জানে, আমিই ওর সর্বনাশের মূল। উপযুক্ত লোক দিয়ে ওর অভিষেকের ব্যবস্থা করুন। মা ইয়েলান্মাই সম্ভান দেবেন উপযুক্ত ভৈরবের। পুরুষ-সিংহের।

তা দিয়েছিলেন মা। বৃদ্ধ সহস্রাঙ্ক নিজে অধর্ব বৃদ্ধ, কিন্তু উপযুক্ত পুরুষ-সিংহের ব্যবস্থা সে করেছিল। মা ইয়েলান্মা যে সর্বশক্তিমান।

ইয়েলান্মাকে চেন তো? চেন না? মহাজাগ্রতা দেবী। বেশ, তার গল্পোটিই আগে শোন। গল্পো নয়, শাস্ত্রের কথা। পুরাণের কথা। খাঁটি সেবনাগরী হরফে লেখা। যা ঐ পণ্ডিতজীই শুধু পড়তে পারেন। তোমার-আমার বোধগম্য ভাষায় বলতে পারেন—

ঋষি জমদগ্নির নাম শুনেছ তো? মহাতেজা ঋষি ছিলেন তিনি। ভৃগুনন্দন মহর্ষি ঋচিক তাঁর পিতৃদেব, আর জননী সত্যবতী। দ্বাদশবর্ষের ভিতরেই চতুর্বেদ কণ্ঠস্থ করে ফেললেন তিনি। তারপর একক-সাধনে ব্রতী হলেন। মহাজ্ঞান যখন লাভ হল তখন তিনি শ্রৌতত্বের সীমানায়। জমদগ্নি এসে উপনীত হলেন ঔর্বা-চ্যবনাদি মহাঋষিদের আশ্রমে—শেষ ব্রহ্মবিদ্যালান্তের প্রত্যাশী তিনি। কিন্তু চ্যবনাদি মুনিঋষিরা বললেন, বাপু হে জমদগ্নি। তুমি মহর্ষি ঋচিকের পিণ্ডদানের কী ব্যবস্থা করে এসেছ বল শুনি? তুমি জ্ঞান না, ব্রহ্মার্চ্যশ্রম আর বাণপ্রস্থের মাকখানে আছে আর একটি ধাপ? সে-ঘাটে পারাণির কড়ি মিটিয়ে এস আগে।

অধোবদন হলেন জমদগ্নি। অগত্যা এসে উপনীত হলেন মহারাজ প্রসেনজিতের দরবারে।

সেদিন প্রসেনজিতের রাজধানীতে মহা ধুমধাম। প্রসেনজিতের একমাত্র দুহিতা—উর্বশী-বিনিমিত্তা রাজকন্যা রেণুকার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন হয়েছে। সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজন্যবর্গ এবং রাজপুত্রেরা সমবেত হয়েছেন রাজসভায় পাণিপ্রার্থীরাপে। এসেছেন কিম্বর ও গন্ধর্বেরাও। দুই সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। দৃশ্য পৌরুষের প্রতীক যুবাব্দ্য। ভাট একে একে প্রার্থীদের শৌর্যবীর্যের কীর্তিকাহিনী শোনাচ্ছে গানে-গানে, আর রাজকন্যা রেণুকা সলজ্জ কস্তুরহস্তে বরমালাটি নিয়ে অপেক্ষা করছে। ঠিক তখনই সভাস্থলের প্রবেশপথে ধ্বনিত হল—অয়ম্ অহং ভো।

জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে দেখে সকলেই প্রণত হল।

সন্ন্যাসীর প্রার্থনা শুনে ধমকে গেলেন প্রসেনজিৎ। তিনি জানতেন, মহাতেজা জমদগ্নির অভিশাপে তাঁর রাজ্য মুহূর্তে ছারখার হয়ে যেতে পারে। তৎক্ষণাৎ মনস্থির করলেন। অব্যত যুবক পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করে ঐ জটাজুটধারী ঋষির বলিরোধাক্ষিত হস্তে সমর্পণ করলেন অনিন্দ্যকান্তি আত্মজাকে।

রেণুকার চোখে জল ভরে এসেছিল কি না? সেটা অবাস্তব প্রশ্ন। শাস্ত্রকার সে কথা নিয়ে মাথা ঘামাননি। মাহারাজ আদালতে জাস্টিস্ কিনায়ক প্যাটেলের রায় শুনে কেউ কি লক্ষ্য করেছিল—সুতনুকার চোখ দুটি বাম্পাকুল হয়ে উঠেছিল কি না?

বৌকনবতী বোড়শী ভাষাকে নিয়ে ভার্গব প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁর আশ্রমে। পুরাণে ক্রিয়তে ভাষাঃ। শাস্ত্রের বিধান। অনতিবিলম্বেই রাজকন্যার মধ্যমেশ স্খীত হয়ে উঠল। অল্প সময়ের ব্যবধানে পাঁচ-পাঁচটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন তিনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল মহামুনি জমদগ্নির। এখন তিনি দায়মুক্ত। পিতৃপুরুষগণ অতঃপর লুপ্তোপিত্তাদক হবেন না। স্ত্রী-পুত্রের কথা বিস্মৃত হয়ে একমনে ধ্যানে বসলেন আবার। সন্তানদের লালন-পালন করার দায়িত্ব বর্তালো মুনিপত্নীর স্বত্ব। রাজকন্যা রেণুকাই বন বনাস্তর থেকে আহরণ করে আনেন ফলমূল, পরিচর্যা করেন আশ্রমধেনুদের। গভীর অরণ্যে এক নির্জন সরোবর থেকে আহরণ করে আনেন পানীয় জল।

একদিন তিনি কলস-কাঁকে সরোবরে এসেছেন জল নিতে। সহসা তাঁর নজরে পড়ল, সম্পূর্ণ নির্জনতার সুযোগে ঐ সরোবরে অবগাহন করছে একটি দম্পতি। নম্রানন! শিহরিত হলেন রাজকন্যা। অতি দ্রুত পত্রাস্তরালে আত্মগোপন করলেন—না হলে ওরা লজ্জা পাবে। গোপনস্থল থেকে দ্বিতীয়বার দৃকপাতমাত্র তিনি চিনতে পারেন ঐ নম্র যুবকটিকে। হ্যাঁ, এ সেই। গন্ধর্ব চিত্ররথ। দীর্ঘদিন পূর্বে স্বয়ম্বরসভায় ঐ যুবকটিও এসেছিল তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে। মনে পড়ে গেল, ভাট যখন ঐ যুবকটির কীর্তিকাহিনী

শোনাচ্ছিল, আর তিনি স্বয়ং বরমাল্যখানি হাতে নিয়ে মনস্থির করছিলেন, ঠিক তখনই সভায় প্রবেশ করেছিলেন ছটাছুটধারী এক সম্মাসী।

রেণুকার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কলসটি ভূতলে নামিয়ে তিনি অন্তরালে বসে নীরবে অপেক্ষা করতে থাকেন। জলকেলীর উচ্ছ্বাস এবং নারী কণ্ঠে আনন্দ-উৎকর্ষের শীৎকার ভিন্ন চরাচর নিস্তব্ধ। কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেলেন রেণুকা। স্বামী-স্ত্রী যে এমন প্রকাশ্য সিবালোকে যৌথ নগ্নত্বান করতে পারে এটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না তাঁর। নীরঙ্ক অঙ্ককারে নিরুপায়-ভাবে পুরুষ বেষ্টনীতে নিগৃহীত হওয়া ভিন্ন দাম্পত্য-জীবনের যে আরও একটা দিক থাকতে পারে এটাই ধারণা ছিল না হতভাগিনীর। তাঁর সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হল। মনে হল, সেদিন ঠিক সেই মুহূর্তটিতে সভায় যদি মহামুনি উপস্থিত না হতেন তাহলে আচ্ছ হয়তো তিনিই ঐ সরোবরে....

না না! ছি ছি ছি।

তাঁর আনত নয়ন থেকে এককিন্তু অশ্রু বরে পড়ল ঐ মৃত্তিকা-কলসের গর্ভে। আর তৎক্ষণাৎ কলসটি বিদীর্ণ হয়ে গেল। কে-জ্ঞানে, অশ্রুকিন্তুটির ভার দুর্বল মনে হয়েছিল কিনা সেই শূন্য মাটির কলসির।

বিরসকলনে রেণুকা প্রত্যাবর্তন করলেন আশ্রমে। ঋষি বিস্মিত হলেন, বললেন, এ কী অনাসুপ্তি! কলস কির্ণ হল কেন? নিশ্চয়ই তুমি কিছু পাপ করেছ! কী?

অথোকলনে নিরুত্তর রইলেন রেণুকা।

ভার্গব ধ্যানে জ্ঞানতে পারলেন সব কথা। এ কী মূর্তিমতী পাপ প্রবেশ করেছে আশ্রমে! তৎক্ষণাৎ তিনি পুত্রদের আদেশ করলেন ঐ পাণিষ্ঠার শিরশ্ছেদ করতে। অথোকলন হল অন্যান্য চার পুত্র। শুধু কনিষ্ঠ পরশুরাম স্বীকৃত হল পিতার আদেশ শিরোধার্য করতে।

পরশুর আঘাতে জননীর অশ্রুসিক্ত শিরটি স্বচ্ছ্যত করে দিল।

তার পরের কাহিনী তো তোমরা জানই। মাতৃবধজনিত অপরাধে পরশুরামের হাত থেকে কুঠার স্বলিত হতে চায় না। ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্যটন করে পরিশেষে ব্রহ্মপুত্রের বশিষ্ঠাশ্রমে শ্রান করে পাণধৌত হবার পর পরশু থেকে মুক্তি পেলেন পরশুরাম।

জমদগ্নি শ্রীত হয়ে পুত্রকে বললেন, বল কী বর চাস?

পরশুরাম নির্বিধায় বললেন, জননীকে আপনার তপঃপ্রভাবে পুনর্জীবিতা করে দিন।

—তথাস্তু! তাহলে একটি নারীমুণ্ড সংগ্রহ করে এনে দে।

—নারীমুণ্ড! কেন? জননীর মুণ্ডটিকেই স্বস্থানে পুনরায় সংস্থাপন করা যায় না?

জমদগ্নি হেসে বললেন, মুর্খ! তা যদি সম্ভবপর হত তাহলে দেবাদিদেবের

জ্যেষ্ঠপুত্রের স্বস্তিহস্তি মুণ্ড বসানো দেখতে পাস কেন? যা, যেখান থেকে পারিস একটা তাজা নারীমুণ্ড সংগ্রহ করে আন।

পরশুরাম তুস্তভোগী। নারীবধের পাপ যে কী নিদারুণ তা প্রত্যক্ষজ্ঞানে জেনেছেন। দ্বিতীয়বার নারীবধের সাহস নেই তাঁর। ওদিকে একটি নারীমুণ্ড সংগৃহীত না হলে মায়েরও পুনর্জীবন লাভ হয় না। এখন কী উপায়?

কিন্তু দেবতাদের বজ্র নির্মাণের প্রয়োজন হলে মানুষই তো এগিয়ে আসে বক্ষপঞ্জর হাতে।

রেণুকার পুনর্জীবনদানের প্রয়োজনে তাই অগ্রসর হয়ে এলেন এক সাধারণী নারী।

‘মাতঙ্গী’ শ্রেণীর এক কুমারী কন্যা। ভার্গবের আশ্রমে স্বৈচ্ছায় উপনীত হয়ে বললেন, আপনারা আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

যুগকাষ্ঠে পেতে দিলেন নিজের মস্তক।

এই অখ্যাতা মাতঙ্গী কন্যাই হচ্ছেন ‘ইয়েলাম্মা’।

লোকগাথা অনুসারে তিনিই হচ্ছেন আদিমতমা দেবদাসী।

তাঁর ছিন্নমুণ্ড রেণুকার স্বস্তি বসিয়ে জমদগ্নি ত্রীকে পুনর্জীবিত করলেন। আর সেই সাধারণী রমণীর ধড়টা? অগ্রয়োজন ধড়টা পড়ে রইল ভাগাড়ে। আজও যেমন জোগতিদের মৃতদেহ সংকারের অভাবে পড়ে থাকে স্বপ্নানে।

কুমারীবলির প্রকারভেদ হয়েছে ইদানীং। যুগকাষ্ঠে মাথা পেতে নিতে হয় না আর আজকাল। নিতে হয়, মাথার কদলে—কেশী।

ইদানীংকালের অর্ঘ্য—ধর্ম! লজ্জা! ইমান! ইচ্ছা!



হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় টেবিলের কাগজপত্র ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। সুতনুকা উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। কাগজপত্র এবং হাঁ, দেবদিল্লর চিঠিখানাও কুড়িয়ে এনে কাগজ চাপা দিল। দমকা বাতাসের শব্দেই বোধহয়, খোকনের ঘুম ভেঙে গেছে। সে কৈদে ওঠে। সুতনুকা উঠে যায়। দেড় বছরের বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়। ব্রাউজের বোতাম খুলে আধঘুমন্ত শিশুর মুখটা চেপে ধরে। মাতৃস্বপ্নের নিশ্চিত আশ্বাসে শিশু আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

খোকন! সুতনুকার সন্তান। চিরবক্ষিতের বহুবাহিত অবাহিত সন্তান। যাকে ও চায়নি, যাকে ও চেয়েছে। জঠরহ যে শিশুর মৃত্যুকামনা করেছে এবং মৃত্যুকামনা করেছে বলে নিজেই ভৎসনা করেছে।

মনে পড়ছে বছর তিন-চার আগেকার সেই মর্যাদিক দিনটার কথা। উৎসর্গ-অভিষেক উৎসব। কী নৃশংস, বীভৎস, ন্যাকারজনক। সেটি ছিল ‘রঙে হুম্মিয়ে’ অর্থাৎ বারবলিতাদের পূর্ণিমা তিথি। এককালে যার নাম ছিল ‘দেবী হুম্মিয়ে’। দেবীরা কালে হয়েছে দাসী, ইদানীং ‘রতি’ অর্থাৎ কেশ্যা। ছয়টি মেয়েকে এ বছর উৎসর্গ করা হবে। তাদের মধ্যে চারজনের বয়স ঠোন্দ থেকে ষোলো, একমাত্র পুষ্পাই নেহাৎ নাবালিকা-একাদশবর্ষীয়া। হ্যাঁ, এ ব্যবস্থা হয়েছে সারদা আইন পাশ হবার কয়েক দশক পর। কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে, পুরোহিত ও রাজতন্ত্রের সমর্থনে আয়োজিত এ উৎসবে প্রতিবাদ করবে? সুতনুকাই ওদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা-অষ্টাদশী।

ইয়েলাম্মা মন্দিরের জমি প্রায় পনের বিঘা। সমস্ত এলাকাটাই উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সামনে মন্দির, পিছনে দেবদাসীদের আবাস। একান্তে আছে একটি ‘জগুলা বাড়ী’ বা জোগতিদের কূপ। জোগতি হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত দেবদাসী। তার পাশে, হাত বিশেক দূরে তোলা হয়েছে গোলপাতায় ছাওয়া একটি অস্থায়ী কুটীর-‘জগুলা ছাপরা’। তাতে জানলা নেই। একটিমাত্র প্রবেশদ্বার। আট হাত বাই ছয় হাত। মাটির মেঝে, নিপুণ হাতে লেপা। তাতে খড়ের ওপর কয়ল বিছানো। ঐ পুণ্যদিনে মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয় জোগতিরা। চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট বছরের কৃদ্ধারা। যারা যৌবনকালে তাদের দেহ দিয়ে সেবা করেছে এ মন্দিরের, এখন নামমাত্র মাসোহারা পায়। যাদের গর্ভজাত জারজ সন্তানেরা হয়তো আজও বাঁধা আছে এখানে-ভৃত্যরূপে অথবা দেবদাসীরূপে। ওরা দেবদাসী ১২

এদিনে আসে নতুন যুগের নতুন দেবদাসীদের অভিষেক সাহায্য করতে। আর সমবেত হয়েছে মন্দিরের পুরোহিতকূল। সংখ্যায় তারা জনা আট-দশ। ভূতাত্ত্বানীয় কর্মচারীরা-জোগতিদের অবৈধ সম্ভানকূল—এই পবিত্র উৎসর্গ দৃশ্যটি দেখতে পায় না। এদিন তাদের প্রবেশ নিষেধ। সম্ভত কারণে; প্রথমত উৎসর্গ-হতে-আসা মেয়েটি হয়তো তারই ভগিনী। দ্বিতীয়ত, এ উৎসবে পুরুষ দর্শনার্থীর সংখ্যাধিক্য অবাস্তব। যে দশ বিশজন মাননীয় অতিথি উপস্থিত হন—দূর দূর দেশ থেকে ঐ পুণ্যদিনে উৎসবে যোগদান করতে সমবেত হন, তাঁরা অধিকাংশই মন্দিরের ধর্মপরায়ণ ধনী পৃষ্ঠপোষক। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি অথবা প্রভূত বিস্ত্রাঙ্গী। তাঁরা হয় এককালীন দান করে ‘আটকা’ বেঁধে বসে আছেন, অথবা মোটা মাসিক দান করে থাকেন। এর ভিতর মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে কাক্ষনমূল্যে ভৈরবরূপে নির্বাচিত করা হয়। অতিথিরা বসেন ঐ কুপের অনতিদূরে একটি চন্দ্রাতপের নিচে।

পুণ্যাহের পূর্বদিন সন্ধ্যায় ছয়জন হবু-দেবদাসীকে নিয়ে ঐ ছাপরায় রাত্রিবাস করতে এল এক বৃদ্ধা জোগতি—সরস্বতী-আম্মা। এই মন্দিরেই তার জীবন কেটেছে। এবং যৌবন। এখন ও এই বাগানের মালিনী। প্রতিদিন ফুল তুলে আনে, মালা গাঁখে, সন্ধ্যায় বসে দেবদাসীদের চুল বেঁধে দিতে, সাজাতে।

পাঁচটি মেয়ের মধ্যে দুজনের সঙ্গে আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলতে হচ্ছে সূতনুকাকে। তাদের ভাষা—মালায়লম্—জানে না সূতনুকা। তাই রুক্ষিণী আর সত্যভামার সঙ্গে কথোপকথন সম্ভবপর নয়। তারা নিজেদের মধ্যেই কী জানি কী কথাবার্তা বলছে। চম্পা আর মেনকা মাদ্রাজের মেয়ে, তামিলভাষী। আর পূম্পা অন্ধ্রের মেয়ে, তার মাতৃভাষা তেলগু।

সরস্বতী-আম্মার মাথায় ছিল একটা বেতের বুড়ি। সেটা সে নামিয়ে রাখে। পাটকরা লালপাড় ছয়খানি শাড়ি বুড়ি থেকে বার করে দড়িতে টাঙিয়ে রাখে। শিউলি-ফুলের বোঁটায় ছোপানো বাসন্তী রঙের শাড়ি। এ-ছাড়া ওর বুড়িতে ছিল সদ্যভাজ্য কতকগুলি নিমগাছের ডাল। সেগুলি যত্ন করে সাজিয়ে রাখতে থাকে। চম্পা প্রশ্ন করে, অত নিমপাতায় কী হবে আম্মা?

—অত কোথায় রে পাগলি? এই তো চাট্টিখানি।

—এই তোমার চাট্টিখানি? গোটা নিমগাছটা ভেঙে এনেছ যে। কেন গো?

নিদগ্ধ হাসি হাসল বুড়ি। বললে, কাল তুই একথা বলবি না কিস্তক্। উন্টেআম্মারেই ধমকাবি—আর চাট্টি নিমপাতা বেশি রাখতে পারিসনি?

—কিস্ত নিমপাতা কী কাজে লাগবে তা তো বললে না?

বুড়ি ততক্ষণে বুড়ি থেকে বার করেছে কিছু আহাৰ্য দ্রব্য : কলা, শশা, শাঁকালু, মুড়িকি, মাইশোর পাক, এক লোটা দুধও। বললে, সে সব বেস্তান্ত পরে হবে। এখন

পেট ভরে খেয়ে নে দিনি। কাল তো পেটে কিল মেরে থাকতে হবে।

একাদশ-বর্ষীয়া পুষ্পা কৌতূহলী হয়ে বলে, কাল খেতে দেবে না? কেন গো?

—কাল যে তোর 'বে' রে পাগলি। দ্যাবতার সঙ্গে বে হবে যে।

সুতনুকা যেটা জানে, চম্পা কিংবা মেনকা সেটা আন্দাজ করেছে। ঐ বালিকা সেটা এখনও কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না। তা হোক, তবু এগারো বছর বয়সে মেয়েরা 'বিবাহ' শব্দটা বোঝে। ঘোড়ায় চড়ে না আসুক—গাঁদা ফুলের মালা গলায় দিয়ে 'দুল্হা' একদিন আসবে একথা কোন্-না-একাদশবর্ষীয়া জানে? কিন্তু দেবতার সঙ্গে বিয়েটা কেমনতর?

সরস্বতী-বুড়ি বুঝিয়ে দেয়,—সেই কাকডাকা ভোরে উঠে কাল তোদের ছান করতে যেতে হবে। ঐ 'জোগতি-বাড়ীর' কুয়োর জলে। ডুঙ্কা-তারা ডোবার আগেই অতিথুরা এসে বসে থাকবে চাঁদোয়ার তলায়। এখান থেকেই তোরা সবাই যাবি। একে একে। একের পর এক। ছোট থেকে বড়। পেরথম পুষ্পা, সব শেষে—কী নাম যেন তোর, হ্যাঁ, সুতনুকা। নিজে হাতে কুয়ো থেকে জল তুলবি। দড়ি-বালতি কুয়োপাড়েই রাখা আছে। হাওয়ায় জল ভরতি করবি। তিন বালতি জল তুললেই হবে নে। তারপর হুস্ হুস্ করে মাথায় ঢালবি। তার আগেই তোদের কপালে, হাতে, বুকে তেল-হলুদ নাগিয়ে দোব আমি। ছান সেরে ভিজে গায়ে একছুট্টে পাইলে আসবি এখানে। গা মোছার কানুন নেই। ভিজে গায়ে এ-ঘরে এলে আমি নতুন কাপড় দেব—ঐ হলুদরঙের শাড়ি। তাই পরে তোরা সার বেঁধে মন্দিরে যাবি। আমি শীখ বাজাব।

সুতনুকা বলে, 'গা-মোছার কানুন নেই' বললেই হল। অতটুকু মেয়ে পুষ্পা, ভিজে-কাপড়ে শীত করবে না ওর?

স্নান হাসল সরস্বতী-আম্মা। শনের দড়ির মতো চুলে ভর্তি মাথাটা নেড়ে বললে, 'ভিজে কাপড়ে' বলি নাই রে পাগলি। বলেছি, 'ভিজে গায়ে'। কাপড় পরারও কানুন নেই যে।

বজ্রাহত হয়ে গেল ওরা। তার মানে?

মানেটা বুঝিয়ে দিতে পোড়খাওয়া প্রাক্তন দেবদাসী ঐ বৃদ্ধাও লজ্জা পেল। কিন্তু এই ওর চাকরি। বছরে বছরে একথা জানাতে হয় তাকে—নতুন যুগের নতুন দেবদাসীদের। কালে যারা হবে জোগতি—শেখাতে আসবে একই কথা আগামী যুগের দেবদাসীদের।

দেবদাসীরূপে যাকে মন্দিরে উৎসর্গ করা হচ্ছে তার শরীরে যে শ্বেতি নেই, শুপ্তকৃত নেই এটা মন্দির কর্তৃপক্ষকে সমুজ্জ্বল নিতে হবে না? তাই এই প্রত্যুষ-স্নানের আয়োজন। আর তাই উচ্চ মূল্য দিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে সমবেত হয়েছেন দর্শকদল। অক্ষতযোনী কুমারী নারীর নগ্নস্নানদৃশ্য দেখতে। শুরু হবে একাদশবর্ষীয়া পুষ্পাকে দিয়ে, সারা হবে দেবদাসী ১৪

অষ্টাদশী সূতনুকার স্নানদৃশ্যে।

‘পহিলে বদরিসম পুন নবরঙ্গ।

দিনে দিনে অনঙ্গ আগোড়ালো অঙ্গ।।’

বাক্‌হারা মেয়েগুলির দিকে তাকিয়ে সরস্বতী-আম্মা বলে, একেই ন্যাংটো হতে নেই। তাতে ভৈরবের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। আমি তাই তোদের মাজায় বেঁধে দুব একটা করে সুতো, আর নাভিমূলের কাছে নটকে দুব এক-একটা নিমের ডাল। এবার বুঝলি? নিম্বার্কের নির্মোকে লজ্জা নিবারণের একটা ব্যর্থ প্রয়াস!

তারপর? তারপর বাসন্তীরঙের শাড়ি পরা মেয়েটির দক্ষিণ বাহুমূলে প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষ পরিণে দেবেন ‘তালী’। গলায় দুলিয়ে দেবেন শঙ্খ ও পুঁতি দিয়ে গাঁথা ‘মঙ্গলসূত্রম্’। কপালে দেবেন চন্দনের ‘তিলক’। সব কয়টি মেয়ে সমবেত হবে মন্দিরে। জোগতিরা তখন তাদের মাথায় অক্ষত তড়ুল ও দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করবে। নতুন উৎসর্গীকৃত মেয়েরা বসবে দেবদাসীদের ঘিরে। শুক্ল হবে মঙ্গলগীতি এবং তারপরে দেবদাসী নৃত্য। সমস্ত দিন চলতে থাকবে নানান আচার অনুষ্ঠান। তারপর সন্ধ্যারতির পর পট্টবস্ত্র পরিধান করে, ফুলসাজে সেজে অভিষিক্ত হবার জন্য প্রস্তুত হবে উৎসর্গীকৃত কুমারী কন্যারা। কোনও দেবদাসী বা জোগতি মেয়েটিকে হাত ধরে নিয়ে যাবে তার বাসরঘরে, যেখানে পট্টবস্ত্র পরে, চন্দনচর্চিত হয়ে অপেক্ষা করছেন তার ভৈরব।

পুষ্পার কৌতূহল তখনও নিবৃত্ত হয়নি। বলে, তারপর? ভৈরব তখন কী করবে?

কেউ একথার জবাব দিল না। না সরস্বতী-আম্মা, না ওর বয়ঃজ্যোষ্ঠা হতভাগিনীদলের কেউ। ওরা জানে, ওরা বুঝেছে—বৎসরান্তে একদিন ভৈরব সাজতে পারার সুযোগে এরা সহস্র রক্ততঞ্চ পর্যন্ত দান করে মন্দির তহবিলে। অনাঘ্রাতা পুষ্পমধুর স্বাদ যে বড় মধুর! উচ্ছিষ্ট বারবণিতার শয্যায় রাজিবাসের সঙ্গে এ ‘তুরীয় আনন্দের’ কোন তুলনা হয়?

না! সেই প্রভাতীস্নানের কথাটা সূতনুকার আজ আর স্মরণ হয় না। সে যেন তখন কেমন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে নিরাবরণ যে একদিন হতে হবে এটা সে জানত। কিন্তু ওর কল্পনায় পরিবেশটা ছিল বেড-সুইচ জ্বলা আধো-অন্ধকার কক্ষ, ওর ধারণায় শয্যাটা হবে কুসুমাকীর্ণ, আর ওর স্বপ্নে দর্শক ছিল চন্দনচর্চিত এক মুগ্ধ দৃষ্টির যুবা-পুরুষ। তাই বিশ-ত্রিশ জোড়া কামুক দর্শনার্থীর সম্মুখে একমুঠি নিম্বার্কের কাছে তার লজ্জাকে গচ্ছিত রেখে সে যখন দ্বার খুলে বার হল তখন সে বাহাজ্ঞান হারিয়েছে। সরস্বতীবাদী বুদ্ধি করে ওর আজানুলব্ধিত কেশরাজি দুভাগে ভাগ করে ওর দু-কাঁধের উপর টেনে এনে বুকের যুগ্ম উচ্ছ্বাসটাকে ঢাকা দিতে চেয়েছিল। সূতনুকা তাও টের পায়নি। তার তখন শুধু মনে পড়ছিল ফ্রেঙ্ক রেডল্যান্ডের বলি মারী

আঁতোনিয়েতের কাহিনী। সাদা চুলে ভরা মাথাটা নিয়ে যখন তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন গিলোভিনের দিকে।

তার চেয়ে সহস্রগুণ বড় আঘাত পেয়েছিল সেদিন সন্ধ্যার পরে।

সমস্ত দিন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে। আশেপাশের কিছুই নজর হয়নি। সন্ধ্যারতির পর সরস্বতী-আম্মা ওকে পরিচয় দিল একটি কাপ্তানের শাড়ি। দু'লিয়ে দিল ফুলসাজ-বাজুতে, মণিবন্ধে, গলায়, মাথায়। সুতনুকা তখনও ভ্রূক্ষেপ করেনি। নিয়তির পরিহাসকে মেনে নিয়েছিল নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায়। তারপর বাসরঘরের দিকে যাবার পথে সরস্বতী ওর হাতে তুলে দিল একটা পানপাত্র। বললে, চরপান্নিতটুকু খেয়ে নে পাগলি, তাহলে শান থাকবে না।

এক ঢোক পান করেই খেমে গিয়েছিল সে—সিদ্ধি?

—ওষুধ। খেয়ে নে।

—সিদ্ধি আমি কখনও খাইনি।

—পাগলি। পুরুষমানুষের ঠোঁটেই খেয়েছি নাকি কোনদিন! খা!

সুতনুকা আর কথা বাড়ায়নি, ঢকঢক করে শেষ করেছিল লোটাটা। জগৎসংসার তখন দুলতে শুরু করেছে ওর দৃষ্টির সম্মুখে।

তবু। তবু, পালঙ্কের উপর পদ্মাসনে-বসা ভৈরবকে দেখে সে আতর্নাদ করে উঠেছিল। অবশ্য এ ঘরের চার দেওয়াল এ জাতীয় আতর্নাদে অভ্যস্ত। বছরে-বছরে এমন পুণ্যদিনে হতভাগিনীদের আতর্নাদ শুনে শুনে প্রাচীর পাষণ হয়ে গেছে। সুতনুকা ওকে চিনতে পেরেছে। হ্যাঁ, সিদ্ধির সরস্বতীর বিশ্বরূপী-মন্ত্র ভেদ করে তার মস্তিষ্ক চিহ্নিত করেছে ঐ লিঙ্গাচ-ভৈরবকে। চেনার কথা নয়। তবুও।

লোকটার মাথায় এখন উইগু নেই, টাক ; গায়ে গাউন নেই, উত্তরীয় ; পরনে প্যান্টলুন নয়, গরসের ধুতি। কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুরাক, গলায় কদ্রাক্ষের মালা, মুখে তৃপ্তির হাসি।

চিৎকার করে উঠেছিল সুতনুকা : যু! যু সোয়াইন, মি লর্ড!

কটর হিন্দুকুলতিলক মহাধার্মিক—জাস্টিস বিনায়ক প্যাটেল!

তিন



খোকন ঘুমিয়ে পড়েছে আবার।
ওকে শুইয়ে দিল খাটে। হাসছে। ঘুমের মধ্যে
দেয়ালা করছে। নিষ্পাপ শিশু।
জাস্টিস্ বিনায়ক প্যাটেলের অবৈধ সন্তান।

মনে পড়ছে, দেবদিল্লির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের
দিনগুলোর কথা।

ইয়েলাম্বা-মন্দিরে দেবদাসীরূপে দীক্ষিত হবার
পরের কথা। একদিন সকালে ক্যামেরাধারী এক
সাংবাদিককে নিয়ে অ্যাডভোকেট গণেশন এসে হাজির।
সহস্রাঙ্ক প্রথমটায় ঐ সাংবাদিক ছোকরাকে মন্দিরে
চুকতেই দেবে না। কিন্তু উকিলবাবুর পরামর্শে তাকে

রাজী হতে হয়। গণেশন সহস্রাঙ্ককে জানালো, ঐ সাংবাদিক ভদ্রলোকের নাম দেবদিল্ল,
ইনি আসছেন বোম্বাই-এর একটি প্রখ্যাত ইংরেজি সংবাদপত্রের তরফে। দেবদাসী
সংক্রান্ত একটি মামলায় বোম্বাই হাইকোর্ট ঐ সম্পাদককে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার
নিযুক্ত করেছেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে একটি সমীক্ষা হচ্ছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টও মেনে
নিয়েছেন এ ব্যবস্থা বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে। ফলে একটি টিম
মাদ্রাজ রাজ্যেও সমীক্ষা চালাচ্ছে। বস্তুত সমস্ত পরিকল্পনাটার পিছনে আছেন কাউন্সিলার
ডক্টর মিসেস্ মুখুলক্ষ্মী রেড্ডি। সমীক্ষকেরা দেবদাসীদের জীবনবন্দি সংগ্রহ করবে।
তাদের আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক এবং দৈহিক তথ্য। আদালত জানতে চান—বর্তমান
দেবদাসীরা কী চায়? অর্থাৎ মিসেস্ রেড্ডির দাবী অনুযায়ী : মুক্তি অথবা বিরুদ্ধপক্ষের
দাবী অনুসারে : বন্ধনের মাধ্যমে নিরাপত্তা।

এত কথা সেদিন জানত না সুতনুকা। যদিও ডক্টর রেড্ডির প্রচেষ্টার কথা জানত।
খবরটা ওকে জানিয়ে গেল মেনকা আর চম্পা। তারা দেখে এসেছে সেই সাংবাদিক
ভদ্রলোককে। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ, ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা। অত্যন্ত সুদর্শন। উঠেছে
অতিথি-শালায়।

সেদিন সন্ধ্যারতির পরে সবাই গোপনে একত্র হল। অতিথিশালায় যখন উঠেছে
তখন আপ্যায়নের ডাক পড়বেই। কিন্তু কার? কে সেই সৌভাগ্যবতী?

সুতনুকা ধমক দিয়ে ওঠে, গুসব কথা থাক। শোন, উনি কী জন্য এসেছেন।

দেবদাসী ১৭

দেবদাসীপ্রথা রোধ করার যে আন্দোলন মিসেস রেড্ডি চালিয়ে যাচ্ছেন সে কথা বিস্তারিত শোনালো ঐ কনভেন্ট-ললিতা দেবদাসী। উপসংহারে সে বলল, উনি যা জ্ঞানতে এসেছেন তা আমরা অকপটে জানাবো। অবশ্য সকলের নামধাম বাদ দিয়ে। জানাবো—দেবদাসী প্রথার অবসান চাই আমরা।

মেনকা বলে, কিন্তু সব কথা কি খুলে বলা সম্ভব?

বাসবী বলে, কেন অসম্ভব? আমাদের আবার লজ্জা কী? বিশ-ত্রিশটা পুরুষমানুষের বিছানায় শোবার অভিজ্ঞতা তো আমাদের সবারই আছে।

পুষ্পা, সেই একাদশবর্ষীয়া মেয়েটি, যার দীক্ষা হয়েছিল গণেশনের আশীর্বাদে, সে এতদিনে বেশ তামিল বলতে শিখেছে। সে প্রতিবাদ করে, না, সবার নেই। বড়দি বাসে।

—হ্যাঁ, বড়দি অবশ্য বাসে।

বড়দি, অর্থাৎ সূতনুকা। এ বৎসরের নতুন দেবদাসীদের মধ্যে বয়ঃজ্যোষ্ঠা হলেও তার চেয়ে প্রবীণা দেবদাসী এ মন্দিরে একাধিক আছে আগে-থেকেই। কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলতে পারা দেবদাসী সে একাই। তাই তার অভিধা—বড়দি।

সূতনুকা অবশ্য একটি ব্যতিক্রম। অভিষেকরাত্রিতে সেই সর্বস্বান্ত হবার পর আর কোনও পুরুষমানুষের শয্যায় তাকে শুতে হয়নি। ইয়েলাম্মা মন্দিরে সে হিসাবে এমন একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে, যা এ মন্দির ইতিহাসে নজির-বিহীন। মন্দির কর্তৃপক্ষ বনাম দেবদাসী। না, ভুল হল। এ ছিল ঘৈরথ সময়। একপক্ষে প্রধান পুরোহিত সহস্রাঙ্ক, অপরপক্ষে মাদার অ্যাঞ্জেলিকার সেই পালিতা কন্যাটি। যুদ্ধের চরম-নিষ্পত্তি এখনও হয়নি, দু-পক্ষই সাময়িক সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে।

অভিষেক-রজনীর শেষে সেই অতি সম্মানীয় অতিথিটি—যিনি এককালীন দশ সহস্র মুদ্রা দান করে বাৎসরিক ভৈরব হওয়ার অধিকার অর্জন করেছেন—যখন মন্দির ছেড়ে গোপনে পালিয়ে গেলেন, তখন তাঁর মাথায় ছিল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বিনা যুদ্ধে সূতনুকা ধরাশায়ী হয়নি। তার কৌমার্যের বিনিময়ে আদায় করেছিল রাজরক্ত। হ্যাঁ, রাজরক্ত বইকি! জাস্টিস্ প্যাটেল তো রাজপ্রতিনিধিই। ঐ সিঁদ্রির সরবংটা যদি পান না করত, তাহলে হয়তো আরও কিছু শাস্তিবিধান করত সে—সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে, প্রৌঢ় লোকটির সঙ্গে ঘৈরথ সময়ে। পারেনি। বারে বারে তার মাথা টলে গেছিল। বারে বারে পদস্থলন হয়েছিল। সিঁদ্রির প্রভাবে। তাই সে শেষরক্ষা করতে পারেনি। জ্ঞান হারাবার পরেই তার অচৈতন্য নগ্ন দেহটা নিয়ে.....

পরদিন তাকে এনে ফেলা হল এক নির্জন কক্ষে। জেলখানার ভাষায় যাকে বলে ‘সলিটারি সেল’, আর মন্দির-পরিভাষায় ‘গুদ্ধিকক্ষ’। দু-দিন সে পড়ে ছিল সেই ঘরে মেঝের উপর। দুদিন—তিনরাতের মধ্যে কোনও আহার্য-পানীয় নিয়ে সে ঘরে কেউ আসেনি তার সন্ধান নিতে। শুধু তাই নয়—জৈবিক বৃষ্টিগুলির উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেই দেবদাসী ১৮

সে ঘরে। ফলে পুষ্টিগতভাবে পরিবেশে ভুশয্যায় পড়ে ছিল সূতনুকা। তৃতীয় দিনে তার ঘর সাফা করা হল। সহস্রাঙ্ক স্বয়ং এল সে কক্ষে। তার হাতে কিছু ফলমূল-আহার্য, এক লোটা দুধ। বললে, উঠে বস সূতনুকা। তুমি অতিথিকে আঘাত করেছিলে। গুরুতর অপরাধ। তা হোক, ত্রিরাত্রির উপবাসে তোমার পাপের স্বালন হয়েছে। তোমায় ক্ষমা করেছি। এবার তুমি আহার্য-পানীয় গ্রহণ করতে পার।

কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হল ভূ-শয্যাশায়িনী। উঠে বসার দৈহিক ক্ষমতা তার ছিল না। কষ্ট তার ক্ষীণ, বিপুল। তবু তার কথা পরিষ্কার শোনা গেল : কিন্তু তোমার পাপের স্বালন তো এখনও হয়নি সহস্রাঙ্ক।

—চোপ রাও! দেবদাসীরা আমাকে ‘আপনি’ বলে কথা বলে, ‘পণ্ডিতজী’ বলে।

হাসল সূতনুকা। বললে, যে-কথা বলছিলাম। তোমার পাপের স্বালন এখনও হয়নি। আমি তোমাকে ক্ষমা করিনি, সহস্রাঙ্ক। ওসব ফিরিয়ে নিয়ে যাও তুমি।

দুরন্ত বিষ্ময়ে স্তম্ভিত পুরোহিত প্রশ্ন করে, মানে? খাবে না তুমি?

—না। আমি আমরণ অনশন করব।

—ও। এই কথা। তা কর। এটাও নতুন কিছু নয়। তুমি কি ভেবেছ, তুমি মরে গেলে দুনিয়া তা জ্ঞানতে পারবে? খবরের কাগজে তা ছাপা হবে?

—আমি জ্ঞানি না। জ্ঞানতে চাইও না। আমি বিশ্বাস রাখি—ওপরের আর এক আদালতে তোমাকে আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেখব। দেখি, অনশনে মৃত দেবদাসীর অভিসম্পাতের ফল ফলে কি না।

সহস্রাঙ্ক এবার ভয় পেয়ে গেল। আর কোন ভয় তার থাক না থাক, ধর্মভয় তার মজ্জাগত। কুসংস্কারই তার বর্ম, ফলে তাতেই তার দুর্বলতা। ঐ নিগূহীতা নারী যদি এই মন্দিরের চৌহদ্দিতে অনশনে প্রাণ দেয় তাহলে দেবতার রোষ কীভাবে নেমে আসবে সে জানে না। সূতনুকাই প্রথম বিদ্রোহিনী নয়, চরম বিদ্রোহ এর পূর্বেই একজন করেছিল—মল্লিকা। কিন্তু তার মৃত্যু হয়েছিল উৎসর্গিত দেবদাসী হবার আগেই। সেটা নারীহত্যা—তাতে ও ভয় পায় না। কিন্তু এ যে দেবদাসী হত্যা। এ যে দেবতার সম্পত্তি। তার উৎসর্গ হয়ে গেছে, অভিষেক হয়ে গেছে, তার কণ্ঠে এখনও আছে ‘মঙ্গলসূত্রম্’, বাজুবন্ধে ‘তালী’। এ দেহ যে দেবতার, নারায়ণের এবং অতিথি নারায়ণের। সহস্রাঙ্কর তো নয়।

আরও কদিন পরে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আবার এল সহস্রাঙ্ক। আরও একটা কারণ ছিল। কী-জ্ঞানি কী-করে এই রুদ্ধদ্বার কক্ষের বারতা দেবদাসী মহলে পৌঁছে গেছে। বিদ্রোহের একটা কালো করাল ছায়াপাত ঘনিয়ে উঠছিল। জোগতিরা গোপনে গিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল প্রধান পুরোহিতকে। তাই আপাতত যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়েছে, যদিও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সহস্রাঙ্ক কথা দিয়েছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে সূতনুকাকে আর

কোনও পুরুষের শয্যাশায়িনী হতে হবে না। সূতনুকাও কথা দিয়েছে সম্মানহানীকর না হলে মন্দিরের নিয়ম-কানুন সে মেনে চলবে।

তাই পুষ্পার উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে এবার সূতনুকা বলে ওঠে, না! আমার কোনও লজ্জা হবে না। কোনও সঙ্কোচ হবে না। আদ্যন্ত সত্যকথা বলব আমি। জোগতি-বাণীর নগ্ন-স্তনের কথা, এবং সে রাত্রে ধর্ষণের কথাও। অবশ্য কে যে সেই পাপ কাজটা করেছিল তার নাম আমি বলব না।

—কেন বড়দি?—কৌতুহলী পুষ্পা জানতে চায়।

—যেহেতু আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মন্দিরের নিয়ম-কানুন আমি মেনে চলব। তোমরা কথা দাও—আদ্যোপান্ত সত্যকথা বলবে?

ওরা সত্যবদ্ধ হল। এনকোয়ারি কমিশনের কাছে আদ্যন্ত সত্যভাষণ করবে।

চার



এক-এক দিন এক-এক জনের ডাক পড়ে। দীর্ঘ সময় ধরে চলে সওয়াল-জবাব। দোভাষীর মাধ্যমে। আগন্তুক সাংবাদিক মহারাষ্ট্রীয়। দাক্ষিণাত্যের কোন ভাষা জানেন না। কুশ্বিনী, চম্পা, সত্যভামা, লক্ষ্মি, মালতীর জবানবন্দী হয়ে গেল। সূতনুকার ডাক আর আসে না। ওরা ফিরে এসে বলল, অকপট ভাষণে ওরা নিজ-নিজ মর্যাদাসিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছে। বলেছে, তারা মন্দিরের নিরাপত্তা চায় না, মুক্তি চায়।

জোগতি সরস্বতী-আম্মা এসে বলে গেল, পরদিন যাবে তিনজন, কৃষ্ণা, মেনকা আর পুষ্পা।

সূতনুকা অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠে, আমার দিন কবে পড়েছে আম্মা?

—দূর পাগলি! তোরে ডাকবেই না!

—ডাকবেই না? কেন? সকলের জবানবন্দী তো নেবার কথা।

—পণ্ডিতজী তোর নামই লেখায়নি। তুই কী সব উন্ট-পাণ্ট বলে আসবি। হয়তো আবার উপস্ গুরু করবি।

এ আশঙ্কা সূতনুকার ছিলই। এক বার ভাবল সহস্রাব্দের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঝগ্ন করে। তাপর ভাবল, দেখাই যাক না কতদূর গড়ায়। দূরস্ত কৌতূহল হল ওর। পুষ্পা যখন জবানবন্দী দিতে গেল, ও আড়ি পাতল পিছনের গলিপথে।

ঘরে মাত্র দুজন ব্যক্তি। একজন পুরুষ একজন মহিলা। পুরুষটি তার দিকে ফিরে বসেছেন, তাকে দেখেই চমকে উঠল সূতনুকা। তার মনে হল, কন্দর্প বুঝি বিশ্বকর্মার ভূমিকায় অভিনয় করতে ধরাধামে নেমে এসেছেন। বোধকরি তিনি বারে বারেই আসেন, প্রতি শতাব্দীতে। মহিলাটি আছেন পিছন ফিরে। তাঁর মুখখানা দেখা যাচ্ছে না। আর পুষ্পা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে সামনের একটি চেয়ারে।

যুবকটি ঝগ্ন করলেন, You seem to be in your early teens, I hope you are not to entertain the guests in the physical sense (তুমি তো নেহাৎ বালিকা। আশাকরি দৈহিক অর্থে অতিথিদের পরিতৃপ্ত করতে হয় না তোমাকে?)

সূতনুকার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে যে মহিলা সে ঝগ্নটি তেলেণ্ড ভাষায় অনুবাদ করে শোনালো : তুমি নিশ্চয়ই গান গাইতে জানো। নাচতেও জানো নাকি?

পুষ্পা সলজ্জে তার মাতৃভাষায় জানায়, গান আমি জানি। নাচতেও। তবে যখন

আমাকে জামা-কাপড় খুলে নাচতে বলে ওরা....তখন, তখন ভীষণ লজ্জা করে। কিন্তু অবাধ্য হলে কঠিন শাস্তি পেতে হয়।

এবার দোভাষী ইংরেজিতে অনুবাদ করে জবাবটা শোনালো সাংবাদিককে, না, আমি শুধু গান গাই আর নাচি। আমার ভাল লাগে।

বল্লাহত হয়ে গেল সুতনুকা। এতক্ষণে দোভাষীকে সে সনাস্ত করেছে। আদালতে দেখেছে তাকে। অ্যাডভোকেট গণেশনের স্টেনোগ্রাফার।

ততক্ষণে দেবদ্বি ইংরেজিতে পেশ করেছে তার পরবর্তী প্রশ্ন, তুমি কি এখানে বেক্ষায় এসেছ?

পুষ্পা তার মাতৃভাষায় জানালো, না। সে হতা।। তাকে অপহরণ করে আনা হয়েছে।

দোভাষী সরল ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনালো, আছে হ্যাঁ। আমার বাবা-মা এটাকে একটি পুণ্যকাজ বলে মনে করেন। আমিও তাই করি।

পা টিপে টিপে পালিয়ে এল সুতনুকা। কাউকে কিছু বলল না। সে বুঝে নিয়েছে নারকীয় ষড়যন্ত্রটা। গণেশন আর সহস্রাক্ষ কী চাল চলেছে। মরিয়া হয়ে সে সরস্বতী-আম্মার দ্বারস্থ হল। বললে, সে গোপনে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। সরস্বতীকে দূতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

এমন কাজ বুড়ি আগেও করেছে। অনেক-অনেক বার। কিন্তু এবার সে বঁকে বলল। বলল, সে শুড়ে বালি রে পাগলি। লোকটা একত্রে স্ব্যশ্শ মুনি। পণ্ডিতজী পেরথম দিনেই বলেছিল, আমার সেকদাসীদের সবাইই তো দেখলে, বল, সন্জেকেলায় তোমার সেবার জন্য করে পাঠাব? তা লোকটা ঘট ঘট করে মাথা নেড়ে বললে, ওসব কামেলি তার নয় না।

সুতনুকা বলে, তা হোক। একটা চিঠি তুমি শুধু পৌছে দাও। আর কথাটা গোপন রেখ।

—সে আর আমারে বলতে হবেনি। দাও। নিখে দাও তাইলে।

পত্রপাঠে স্তম্ভিত হয়ে গেল দেবদ্বি। এমন মুন্ডোর মতো ঝরঝরে হস্তাক্ষরে, এমন বিস্তৃত ইডিওমেটিক অ্যাংলো-স্যাকশন ইংরেজিতে কোনও দেবদাসী পত্রালাপ করতে পারে এটা ওর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কিনা কাটাকুটিতে লেখা আছে :

“আপনি যে জবানবন্দি নিয়ে চলেছেন তা আদ্যন্ত ভ্রান্ত ও ক্রটিপূর্ণ। মেয়েরা যা জবাব দিচ্ছে দোভাষী ইচ্ছা করেই তার বিপরীত অনুবাদ করছেন। প্রসঙ্গত—দোভাষী নির্বাচন কে করেছে? আপনি কি জানেন, উনি অ্যাডভোকেট গণেশন-এর স্টেনোগ্রাফার? এবং গণেশন সহস্রাক্ষের অ্যাটর্নি? আপনি সহস্রাক্ষকে বাধ্য করুন আমাকে জবানবন্দি দেবদাসী ২২

দেওয়াতে। আমার নাম তালিকায় নেই। কিন্তু আমি একজন স্বীকৃত দেবদাসী। চিঠিখানি, বলাবাহুল্য, পুড়িয়ে ফেলবেন। সর্বত্রই সহস্রাক্ষর সহস্র-অক্ষ। আমার নাম সূতনুকা। আমি একজন দেবদাসী।”

তীক্ষ্ণদীপ দেবদাসী মুহূর্তে বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। এমন একটা আশঙ্কার কথা ইতিমধ্যেই তার মনে জেগেছিল। অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় এখানকার দেবদাসীরা ক্রমাগত উষ্টো কথা বলে চলেছে। কেন? কেউই অসুখী নয়। সবাই স্বচ্ছন্দ সব কিছু করছে। ব্যাপার কি?

এখানে আসার আগে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার কথাটা গুর খেয়াল ছিল না। সেটা বুকল অকুস্থলে উপনীত হয়ে। দেবদাসী বোম্বাই অফিসে একটি তার-বার্তা পাঠাতে চেয়েছিল তামিল-তেলেগু জানা একজন স্টেনোগ্রাফার চেয়ে। তাতে গণেশন বলেছিল, টেলিগ্রাফ পেয়ে স্টেনোর আসতে পাঁচ-সাতদিন লেগে যাবে। তার কী প্রয়োজন? মাদ্রাজেই উপযুক্ত দোভাষী আর স্টেনো পেয়ে যাবেন আপনি। দৈনিক চুক্তিতে।

এর পিছনে যে এমন একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র থাকতে পারে, তা কল্পনাই করেনি। সে কিন্তু সহস্রাক্ষকে বলল অন্য কথা। একা-একা তার আর রাত কাটছে না। সহস্রাক্ষ খুশি হয়। এই তো। মাছে টোপ গিলেছে। বলে, এ আর বেশী কথা কী? আপনি মন্দিরের সম্মানিত অতিথি। বলুন, কাকে পাঠাবো? ওদের নাম তো জানেনই, অনেককে চাক্ষুষ দেখেছেনও।

—বাকি পাঠাবেন, তাঁর নাম : সূতনুকা।

সহস্রাক্ষ কী বলবে ভেবে পেল না। তুরুরের টেকা পেড়ে লীড দিল কেন ও ছোকরা? এ নামটাই তো তালিকায় নেই! ও জানল কী করে?

দেবদাসী হেসে বলে, না আপনি প্রাথমিক যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে ওর নাম নেই। কিন্তু মেয়েটি যে-কোন কারণেই হোক আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আপনাদের ঐ বৃদ্ধা জোগতি সরস্বতী-আম্মার হাতে আমাকে একটা প্রেমপত্রও পাঠিয়েছে। বিশ্বাস না হয় তাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

—না না। অবিশ্বাস করার কী আছে? আচ্ছা তাই হবে।

সেদিন সন্ধ্যারতির পর সহস্রাক্ষ ডেকে পাঠালো সূতনুকাকে।

—সরস্বতীর হাতে কী চিঠি পাঠিয়েছিলে ঐ মারাঠী ছোকরাকে?

সূতনুকা একটু অবাক হয়। রাত না পোহাতেই সরস্বতী-আম্মা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জবাব না দিয়ে সে প্রতিপ্রশ্ন করে, অতিথিদের প্রেমপত্র লেখা কি মন্দির-আইনে নিষিদ্ধ?

সহস্রাক্ষ একটু অবাক হল। হয়তো মেয়েটার মন বদলাচ্ছে, বদলেছে। তিন-চার মাস হয়ে গেল তো! অনিবার্য নিয়তিকে ক্রমে ক্রমে মেনে নিচ্ছে। আর তাছাড়া মদন

পঞ্চশরের বাণ কখন যে কার বুকে বেঁধে.....

গম্ভীর হয়ে বললে, শোন সূতনুকা। ও ছোকরাও তোমাকে চায়। ওকে যদি গেঁথে তুলতে পার তাহলে তোমাকে যথোচিত পুরস্কার দেব আমি। কিন্তু যদি আমাদের সর্বনাশ করতে চাও....

সূতনুকা হেসে বলে, আপনি মাঝে মাঝে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেন কেন বলুন তো? এর আগের দিনই তো বলেছি, মৃত্যুকে আমি ডরাই না।

জ্বলন্ত চোখ-জোড়া গুর মুখে মেলে ধরে সহস্রাঙ্ক বলল, অনশন মৃত্যু? না, সূতনুকা সে ভয় আমিও তোমাকে দেখাচ্ছি না, তুমিও আমাকে দেখিও না। শুধু তোমাকে একটা কথা জানাবার সময় হয়েছে। তোমার আগেও একটি মেয়ে আমার বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। তার নাম : মল্লিকা। তাকে—

—আপনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে মন্দির প্রাঙ্গণেই তাকে সমাধিস্থ করেছেন। এই তো?

—না। সে শুয়ে আছে বঙ্গোপসাগরের তলায়। আমি তাকে হত্যা করিনি। কেউই তাকে হত্যা করেনি। আমি শুধু তাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম মাদ্রাজ ডক-ইয়ার্ডে, কাক্সি খালাসিদের আস্থানায়। তারা কেউ মল্লিকার গলা টিপে ধরেনি—আদর-সোহাগ করেছে শুধু। কিন্তু এক রাতে দু-তিনশ স্মৃথার্ত কাক্সির সোহাগ সে সহ্য করতে পারল না। রাত ভোর হবার আগেই তলিয়ে দিতে হল তার মৃতদেহটা ভারি পাথরে বেঁধে।

সূতনুকা জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়েই রইল শুধু।

—শোন। এক শর্তে আমি তোমাকে গুর কাছে পাঠাব। তুমি জানাতে পারবে না, কে ছিল তোমার অভিষেক-রজনীর ভৈরব।

—শুধু সে-কথাটাই বলা বারণ? কেন?

—সেটাই মন্দিরের কানুন। যা মানতে তুমি প্রতিশ্রুত। মন্দির-অতিথিদের পরিচয় গোপন রাখতে দেবদাসীরা প্রতিশ্রুত। তুমিও সেদিন সেই মর্মে প্রতিজ্ঞা করেছ।

—আর সব কথাই বলতে পারি আমি? জোগতি-বাড়ীর কথা, অভিষেকের কথা?

—হাঁ পার। সে সব ও জানেই। কেউ না কেউ বলেছেই। এ মন্দিরে না হলেও অন্যত্র।

—শুধু উচ্চারণ করতে পারব না জাস্টিস্...

—বাস। ও নাম তুমি আমার কাছেও উচ্চারণ কর না। যাও।

সূতনুকা প্রস্থানোদ্যত হতেই পিছন থেকে গুনল, শোন! মনে রেখ! এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে মল্লিকা আর একা-একা সমুদ্রের তলায় শুয়ে থাকবে না।

সূতনুকা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, মনে থাকবে।



সন্ধ্যারতির পর একরাশ ফুল নিয়ে সরস্বতী-আম্মা
ওকে সাজাতে এল।

—এ সব কী হবে? ফুলের দরকার নেই।

—দরকার তোর নয় রে পাগলি, দরকার আমার।
এই হচ্ছে নিয়ম। ধর্তে গেলে আজই তোর অভিষেক
হচ্ছে। না কি বল? সেবার তো তোরে জ্বাই করল
বুড়ো-মিনষেটা। তেনার মাথা ফাটানোটা অবশ্য অন্যায়
হইছিল তোর—তা কি বলে-ভালো, ন্যায্য কথা বলব-
আমি হলেও তার মুণ্ডটা অমনিভাবে খেঁৎলে দিতাম।

ঝিলঝিল করে হেসে ওঠে সূতনুকা। বলে, তাতে
তোমার পাপ হত না?

—হতনি? নিষাস্ হত। তা কী করব? প্রাচিস্তির করতাম।

—কিন্তু আমার গোপন চিঠি পাঠানোর কথা যে তোমার পণ্ডিতজীকে বলে দিলে
এতে তোমার পাপ হল না?

আকাশ থেকে পড়ল বুড়ি। ইয়েলাম্মা-মায়ের নামে শপথ করে বললে, পণ্ডিতজীকে
সে কিছুই জানায়নি।

—তাহলে সহস্রাঙ্ক জ্ঞানল কেমন করে যে, আমি চিঠি লিখেছি?

—তোমার নাগরই বলেছে নিদ্ঘাৎ। তারেই শুধিও।

সরস্বতী মনের মতো করে সাজালো ওকে। ওর গায়ের রঙ কনকচাঁপা, তাই
আশুনরম্ভ একটা মাইশোর জর্জেট জড়ালো তার তরীতনু ঘিরে। গায়েও ঐ রঙের
জ্যাকেট। গলায় কনকচাঁপার মালা, খোঁপায় বেলফুলের গোড়ে। বাহুবন্ধে জুইয়ের
বন্ধনী।

প্রথমফিক তার হাত ধরে অতিথিশালায় নিয়ে এল। ঘারে মৃদু করাঘাত করতে
দ্বার খুলে দিল অতিথি। তার পরনে পায়জামা, উর্দ্বাঙ্গে সামারকুল গেলি। বুড়ি তাকে
বললে, ফুলের মালা দে-গেলাম, সওদাগর। সুতোটা বড় পল্কা। দেখ বাপ্। মালা যান্
ছিড়ে না যায়।

অতিথি সহাস্যে বললে, ছিড়েবে কেন আয়ী-মা? প্রসাদী ফুলের মালা যে মাথায়
রাখতে হয়।

—তাই বল কেন! কাল ভোরে আস্যে আমার বস্কিস্ নিয়ে যাবনে, সওদাগর।

নিজেই দ্বারটা টেনে বন্ধ করে দিল বাহির থেকে।

সূতনুকা চোখ তুলে দেখল। অতিথি সহাস্যবদনে প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। সূতনুকা এক পা এগিয়ে এল। হাঁটু গেড়ে বসল। অতিথির পদপ্রান্তে নামিয়ে-রাখে একটি সলজ্জ প্রশ্নাম।

অতিথি ওর বাহমূল ধরে তুলল। চিবুকা ধরে মুখখানি উঁচু করল। আবেশে সূতনুকার চোখ দুটি বুজে গেল। সেবদিন্ন গুকে ধীরে টেনে নিল তার কবাট বক্ষে। তার অধরোষ্ঠ নেমে এল নিচে।

শিউরে উঠল সূতনুকা।

কিন্তু পরমুহূর্তেই পরম কিম্বদ। বাহবন্ধে ধরা-দেওয়া নায়িকার কৰ্ণমূলে সেবদিন্ন অতি ক্ষীণস্বরে বললে, কিছু মনে কর না। এটা অভিনয়। সহস্রাঙ্ক নিশ্চিত আড়ি পাতার ব্যবস্থা করেছে। প্রথম রাত্রে আমরা শুধু অভিনয়ই করে যাব।

অভিনয়। অতি পূর্বক নি-খাতু অল। কৃত্রিম ভাবে প্রেম নিবেদন? ভান করা।

কেমন করে করবে সূতনুকা? তার প্রশ্নটি তো 'ভান' নয়। তার অধরোষ্ঠ তো অভিনয় করেনি। তার সর্বাস্থের শিহরণ তো কৃত্রিম নয়।

সেবদিন্ন গুকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কে বসিয়ে দিল। আবার কানে কানে বলল, জানলটা খুলে দিয়ে আসছি। বে লোকটা আড়ি পেতেছে তার বেন অসুবিধা না হয়।

উঠে যায় জানলার ধারে। খুলে দেয় পাল্লাটা। সেখান থেকেই ইংরেজিতে প্রশ্ন করে, তুমি কতদিন আছ এ সেব-মন্দিরে?

সূতনুকা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। ইংরেজিতেই বলে, অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে আসিনি। আমি সেবদাসী। আজ রাত্রে আপনাই আমার সেবতা। সে সেবমন্দিরে এসেছি পাঁচ-মিনিট আগে।

খুশি হল সেবদিন্ন। বললে, সেই ভালো। সপ্তরাল-জবাব দিনের বেলায় জন্য তোলা থাক। আজ আমরা স্তনিকবাদী। প্রতিটি মুহূর্তের মূল্য প্রতিটি মুহূর্তে আদায় করে নিতে হবে। তবে শুধু একটা কথাই জবাব দাও। তুমি কি এ জীবন নিয়ে সুখী?

—কেন নয়? বিবাহিতা রমণীরা বৈচিত্র্যের স্বাদ পায় না। বারবণিতাদের নেই নিরাপত্তার নিশ্চিন্ততা। আমরা, সেবদাসীরা দুটিই পেয়েছি সেবতার আশীর্বাদে। কেন সুখী হব না আমরা? কেন? কেন?

সেবদিন্ন প্রশ্ন করল, তোমার প্রাস্তন-জীবনের কথা জানতে চাইছি না, কিন্তু তোমার মাতৃভাষা কী?

—মারাঠী।

হো-হো করে হেসে ওঠে সেবদিন্ন। এবারও ইংরেজিতেই বলে, তবে ঐ বিজাতীয় ভাষায় কথা বলছি কেন আমরা?

সেবদিন উঠে আসে খাটের উপর। থেম-কুছনের মতো নিম্নকণ্ঠে মারাঠীভাষায় বলে, তুমি ছাড়া এ মন্দির চত্বরে মহারাত্রীমান ভাষা জানে আর কে কে?

সূতনুকা ওর আলিঙ্গনপাশে ধরা দিয়ে বলে, কেউ না। সুতরাং আড়িপাতনেবালা এবার ভাগবে।

—আমরা যে প্রেমলাপ করছি, তাতে এমনিতেই সে ভাগবে। সহস্রাঙ্ক নিশ্চিন্ত হবে। আলোটা নিবিয়ে দেব?

সূতনুকা বলে, অস্বী মা তো আর কোনও শাড়ি রেখে গেল না। রাতে কি পরে শোব?

—আলো নিবিয়ে দিলে কিছু যে একটা পরতেই হবে তার মানে কি?

—বাঃ! আমরা তো অভিনয় করছি।

—ওধু অতীত নিয়ে খাঁটাঘাটি করতে আমিও আসিনি। বাতিটা নিবে যার ফুৎকারে।

পরদিন ভোর বেলা সরস্বতী-আম্মা অতিথিশালায় এসে তার ‘বস্কিস’ আদায় করতে পারেনি। তার আগেই ভোর রাতে উঠে সেবদিন বাস ধরে চলে গেছে মাদ্রাজ। এইখানে বলে রাখা দরকার, ইয়েলান্দ্রা-দেবীর যে মন্দিরের কর্ণা ইতিপূর্বে করা হয়েছে সে মন্দিরটি কর্ণাটকে অবস্থিত। দেবদাসীদের উৎসর্গ ও অন্যান্য কর্ণাও সেই মন্দিরের ইতিহাস বেঁটে। কিন্তু সারা ভারতবর্ষেই যেমন আছে কিছানাখের মন্দির, যদিও তার মূল মন্দিরটি কানীতে, তেমনি মাতা ইয়েলান্দ্রার অনেক মন্দির ছড়িয়ে আছে দক্ষিণ ভারতে। আমাদের ঐ কাল্পনিক মন্দিরটি—যার প্রধান পুরোহিতের নাম সহস্রাঙ্ক, সেটি মাদ্রাজ শহরের কিছু দক্ষিণে, মহাবলীপুরম্ মন্দিরগুলির অনতিদূরে। ফলে, বাসযোগে মাদ্রাজে গিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ ফিরে এল সেবদিন। তার সঙ্গে একজন মহিলা স্টেনোগ্রাফার। মাদ্রাজ প্রেসক্লাব থেকে তাকে সংগ্রহ করে এনেছে। ওর প্রতিদিনের সেই ‘শ্রুতিধরলী’ যথারীতি বেলা দশটায় এসে হাজিরা দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সেবদিন তাঁকে সেদিনের মজুরিটি মিটিয়ে বিদায় করল ধন্যবাদ জানিয়ে। বলল, সংবাদপত্র আয়োজিত স্টেনোগ্রাফার এসে গেছেন, সঁকে আর দরকার হবে না। মহিলাটি বোধকরি এতদিন সশঙ্কটিস্তেই গণেশনের নির্দেশে ঐ কুকর্ম করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নমস্কার করে, দিনের মজুরিটি নিয়ে বিদায় চাইলেন। সেবদিন বলল, আপনার শর্তহান্ড নোটবইগুলি রেখে যেতে হবে।

—কেন? ওগুলো ডিসাইফার করে টাইপ করা কাগজগুলো তো দিয়েছি।

—হ্যাঁ, তাতেও আপনার সই দিতে হবে। নোটবইগুলোও আমার চাই।

ভদ্রমহিলা ওর মূর্তি দেখে আর উচ্চবাচ্য করতে ভরসা পেলেন না। নির্দেশমতো

টাইপ করা কাগজের তলায় সই দিয়ে এবং নোটবইগুলি গচ্ছিত রেখে তিনি পালাতে পারলে বাঁচেন।

দেবদ্বন্দ্ব যথারীতি সেদিনের দেবদাসীদের সওয়াল-জবাব নিল।

সন্ধ্যায় কি-জানি-কেন গণেশন এসে হাজির।

দেবদ্বন্দ্ব তার সঙ্গে খেজুরে আলাপ করল। জানাল, কাজ ভালই অগ্রসর হচ্ছে।

পত্রিকার নিজস্ব স্টেনোগ্রাফার এসে গেছে, এ খবরও জানাল।

গণেশন বললে, হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম। কিন্তু আগেকার স্টেনোর নোটবইগুলো আটকে রাখলেন কেন?

—প্রয়োজন হলে মিলিয়ে দেব বল। কেন, আপত্তি আছে কিছ?

—না না। আপত্তি কিসের?—গণেশন আর জল ঘোলা করল না।

দেবদ্বন্দ্ব বুঝতে পেরেছে গত চার-পাঁচদিনের পরিশ্রম বেকার গেছে। সেই মেয়েগুলির জবানবন্দি আবার নতুন করে নিতে হবে। কিন্তু শত্রুপক্ষকে এখনই সতর্ক করে দেবার কী দরকার? সে তালিকা অনুসারে পর পর পরবর্তীদের জবানবন্দি নিল সারাদিন ধরে। আশ্চর্য। আজ যেন সওয়াল-জবাব সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বাঁধা। তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? গত রাতেই তো সুজুকা ওকে শুনিয়েছে যে, পুষ্পার জবানবন্দি সে আড়াল থেকে শুনেছে। প্রশ্ন ও উত্তর অনুবাদের মাধ্যমে কীভাবে বিকৃত হয়ে গেছিল তা তো সবই জেনেছে ও।

সন্ধ্যায় যথারীতি এল প্রত্যাশিত সেবাদাসী। আজ আর তেমন সাজের বাহার নেই। পাটভাষা আটপৌরে শাড়ি পরেছে, গলায় মঙ্গলসূত্রম, কানে একটা সাদামাটা রিং আর হাতে, না স্বর্ণালঙ্কার নর, এক গোছা রঙিন কাচের চুড়ি। ভ্রূমধ্যে একটি কুমকুমের টিপ। নিছন নিছন সরস্বতী আশ্রা—তার হাতে ট্রে-তে নানান আহাৰ, আর কফির পাত্র। মন্দিরেও এসেছে আধুনিকতার ঢেউ, অতিথিদের রুচির ব্যারোমিটার বুঝে। তাই তৈরী কফি আসেনি, এসেছে ভিন্ন-ভিন্ন পাত্রে দুধ-চিনি ও গরম কফির লীকার।

সেবাদাসী নর, যেন দিনান্তে মরদ ফিরে এসেছে অফিস থেকে আর গৃহলক্ষ্মী তারই পরিচর্যা করছে।

দেবদ্বন্দ্ব নিজে থেকেই বলে, তোমার ‘কস্কিসটা’ পাওনা আছে, জোগতি।

—সেটা না মিট্রাই পাইলে গেছিলে কেন, বাপ?

—আজ দেব বলে। আমি যে জানতাম, সেটা হাত পেতে নেবার আগে তুমি সমঝে নিতে চাও—মালার সূতোটা ছিঁড়ে গেছে কিনা। কী? মালা ছেঁড়েনি তো?

সরস্বতী আশ্রা এই করেই জীবন কাটিয়েছে। বাকপটুতার সেও কম যায় না। বলে, কেমন করে বুঝব, সওদাগর? যে মালাখানি সন্ধ্যাে রেতে দে গেলাম, সেটা তো আর দেবাদাসী ২৮

ভোর-রেতে ফেরত পেলুম না। এ যে ভিন্ন মালা গো। আমারে না-বলে রাতারাতি তোমরা মালা বদল করলে কোন্ সুবাদে?

—মন বদল হয়ে গেল যে!

দেবদ্বিগ্ন মানিষ্যাগ থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বের করে দিল।

সরস্বতী আত্মা নত হয়ে প্রশাম করে বিদায় হল।

—কফিতে ক-চামচ চিনি দেব?—সুতনুকা সরাসরি নেমে আসে কাজের কথায়।

—কফির আগে চুমু দিলে পাঁচ-চামচ, নইলে বিনা চিনিতে।

—তোমার যেন আজ পাখা গজিয়েছে মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি? দৃতীকে নগদ পাঁচটা টাকা ‘বস্কিস্’ দিলে! আবার এখন কফিতে পাঁচ-চামচ চিনি চাইছ, ডায়াবেটিস্ নেই তো?

দেবদ্বিগ্ন ওকে বুকে টেনে নিল।

আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে সুতনুকা বলে, অত তাড়াছড়ো কিসের? খাবারটা খেয়ে নাও আগে।

—জোগতিকে ‘বস্কিস্’ দিলাম, তোমাকেও দিই।

—ওটা কি আমার বক্শিস্?

—না। ‘বক্শিস্’ অশুদ্ধ উচ্চারণ, কথাটা ‘বস্কিস্’, ইঞ্জিরিতে যাকে বলে boss-kiss! সে-রাত্রে ওদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। পূর্বের চাঁদ পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ল, তবু ঘুমোতে গেল না ওরা। দেবদ্বিগ্ন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল ওর সব কথা। সব, স-ব কথা। বাল্যের, কৈশোরের, তরুণ্যের, যৌবনের। মাদারের স্নেহ-ভালবাসার কথা, আশ্রমের মেয়েগুলির কথা। উৎসর্গ-স্নান আর অভিষেক রাত্রির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিল-শুধুমাত্র ভৈরবের নাম-খাম, পরিচয় উল্লেখ না করে। তার পরের ঘটনাও জানালো। ওর অনশন-সংগ্রাম এবং সহস্রাক্ষের সন্ধির প্রস্তাব। এমনকি মল্লিকার বীভৎস মৃত্যুর কথাও। শোনালো, পুষ্পার মরণাস্তিক যন্ত্রণার বৃত্তান্ত।

উত্তেজিত দেবদ্বিগ্ন কনুই-এ ভর দিয়ে উঠে বসে : পুষ্পা! ঐ তের-চৌদ্দ বছরের মেয়েটা?

—না। ওর বয়স এগারো। একটু বাড়ন্ত বলে মনে হয় তের-চৌদ্দ।

—ওকে দিয়ে একটা দরখাস্ত লেখাতে পারবে? আমাদের পত্রিকা কেসটা চালাবে। সারদা-আইনে সহস্রাক্ষের জেল হয়ে যাবে তাহলে!

—কিন্তু পুষ্পার কী হবে? ওকে যখন ওরা অপহরণ করেছিল তখন ওর বয়স চার-পাঁচ। গায়ের নাম, বাবার নাম ও মনে করতে পারে—কিন্তু তারা তো ওকে ফিরিয়ে নেবে না? তুমি যদি ওর অভিষেকের আগেও আসতে—

—না হয় ও কোনও অনাথ আশ্রমে থাকবে।

—কেন থাকবে? ও অনাথ তো নয়! দু-দিনেই তো ও কব্জবল্লাহ হয়ে যাবে। এই মন্দির থেকে বার করে নিয়ে গেলে ওর আশ্রয়স্থল অনিবার্যভাবে কোনও বেশ্যালয়ে। সেটাই কি চাইছ তোমরা?

সেবদিক্স জবাব দিতে পারে না।

সূতনুকা ওর মাথাটা টেনে নামিয়ে দেয় নিজের হাত-বালিশে। বলে, আমাদের কথা থাক। তোমার কথা বল? তোমার বিষয়ে তো কিছুই জানি না? আমাদের এই মন্দির নিয়ে কতগুলি মন্দির ঘুরলে তুমি?

—সাতটা। মাদ্রাজে এটাই প্রথম।

—আমি যেমনভাবে সব কথা খুলে বললাম, সেভাবে আগেও মেয়েরা বলেছে?

—বলেছে। জবানবন্দি দেবার সময়।

—সে তো দিনের বেলা। আর রাতের বেলা? অন্যান্য মন্দিরে?

সেবদিক্স স্নান হাসল। বলল, না। তার কারণ এর আগে কোনও মন্দিরে রাতের বেলা জবানবন্দি নিইনি। কী? বিশ্বাস করলে তো?

—বিশ্বাস করা কঠিন। তাহলে এবারই বা হঠাৎ এমন উৎসুকে সখ হল কেন?

—তোমার চিঠিখানা পড়ে। একজন সেবাদাসী যে অমন ইংরেজিতে চিঠি লিখতে পারে এটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তা ছাড়া....

—বুঝেছি। ষড়যন্ত্রটা সম্বন্ধে নিতে। সে ক্ষেত্রে রাতে আমাকে আটকে রাখার তো প্রয়োজন ছিল না?

—সূতনুকা! মানুষ কি নিজের মনটাকেই জানে? তোমার চিঠিখানার চেয়েও যে বড় বিষয় তুমি নিজে, তা-তো না দেখে বুঝতে পারিনি। তোমাকে চাক্ষুষ দেখলে—

—থাক ওকথা। তোমার নিজের কথা বল। বাড়িতে কে কে আছেন? বাবা, মা, ভাই বোন?

সেবদিক্স বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক রইল। তারপর মনস্থির করে বলল, না। সব কথাই তোমাকে খুলে বলব। একথা কখনও কোনও বন্ধুবান্ধবকে বলিনি। কেন জান? আমার জীবনেও পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এক বেদনার ইতিহাস। বেদনার শুধু নয়, লজ্জার। যা তোমার লজ্জাকর ইতিহাসকেও ছাপিয়ে যাবে।

এবার সূতনুকাই উঠে বসে কনুইয়ের ভর দিয়ে। বলে, কী যা তা বলছ। আমার নির্লজ্জ ইতিহাসকেও ছাপিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ! তুমি তো নিয়তির হাতের পুতুল। তোমার বাবাকে তুমি শ্রদ্ধা কর। তোমার মাকে ভক্তি কর। তিনি সতী..... আর আমার মা.....

সেবদিক্স শুনিয়েছিল তার ইতিহাস।

বড় ঘরেই ওর জন্ম। বাবা লক্ষপ্রতিষ্ঠ সরকারি অফিসার। মাও ধনির সন্তান। ওর দাদামশাই ছিলেন দাক্ষিণাত্যের এক রাজার দেওয়ান। সেবই মায়ের একমাত্র সন্তান। গর্ভিণী অবস্থায় তিনি পিত্রালয়ে ফিরে এসেছিলেন বিবাহের দু-বছর পর। তারপর পিত্রালয়েই পুত্রসন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে তিনি মারা যান। ওর বাবা কোনদিন খোঁজ নিতে আসেনি; ওর জন্মের আগেও নয়, পরেও নয়। স্পষ্টাক্ষরে কেউ কিছু ওকে জানায়নি। বয়ঃপ্রাপ্তির পর ওর সন্দেহ হয়েছে ওর বাবা বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর স্বীর গর্ভে ছিল অন্য কোন পুরুষের সন্তান। অর্থাৎ সে জারজ। ওর বাবা এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু কোনও যোগাযোগ নেই। দেব মানুষ হয়েছে দাদামশাইয়ের কাছে। জানলিজন্ম নিয়ে এম. এ. পাস করে এই চাকরিটা পেয়েছে। দাদামশাই গত হয়েছেন। কিন্তু মামারা আছেন। তাঁরা নিজে থেকে কোনদিন কিছু বলেননি। দিবদিগ্নও জানতে চায়নি।

—কেন? তোমার কৌতূহল হয়নি জানতে?

—হয়েছিল। কৌতূহল দমন করেছি। যেমন একটু আগেই করলাম। যখন তুমি বললে, অভিষেক-রাত্রি তোমার ভৈরবকে দেখে চমকে চিংকার করে উঠেছিলে তুমি। কিন্তু কারণটা বলনি। সে কি কুংসিত, বিকলাঙ্গ, ‘কোয়াসিমোসো’ বলে? নাকি তাকে চিনতে পেরেছিলে বলে? অথবা সহস্রাঙ্ক নিজেই হয়েছিল তোমার ভৈরব?

সূতনুকা নতনেত্রে চুপ করে রইল। তারপর ধ্বংস করে, তোমার বাবা আবার বিয়ে করেননি?

—তাও জানি না। চেষ্টা করলেই জানতে পারতাম। জানতে চাইনি।

—কেন?

—কী দরকার? তিনি আমাকে স্বীকার করেননি। আমিই বা তাঁকে স্বীকার করব কেন? তাঁর খোঁজ নেব কেন?

এরপর আলোচনাটা মোড় নিল ডক্টর মুখুলশ্রীর থ্রেস্টার দিকে। দেবদাসী-প্রথা উচ্ছেদের বিষয়ে। সূতনুকা বললে, এত এত দেবদাসীকে তোমরা মুক্তি দিতে চাইছ। কিন্তু মুক্ত পৃথিবীতে ফিরে এসে তারা কী করবে? তারা বাঁচবে কী করে? আর কোনও বিদ্যা তো তারা জানে না?

—সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। নতুন কারিগরী বিদ্যা ওদের শেখাতে হবে—তাঁত বোনা, পশম বোনা, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ আরও কত কি।

—তার মানে ওরা স্বাভাবিক জীবনে কোনদিনই ফিরে আসতে পারবে না? স্বামী, সন্তান, সংসার ওদের হবার নয়?

—কেন নয়? অনেক উদারচেতা আধুনিক যুবক হয়তো ওদের ভালবেসে বিয়েও করবে। তখন তারা স্বামী, সন্তান, সংসারও পাবে?

—তুমি বিশ্বাস কর? এমন যুবক আছে দেশে?

—কেন নয়? আমি নিজেই তো একজন। তুমি যদি এই বন্দিন্দশা থেকে মুক্তি পেতে তাহলে আমিই তোমাকে দ্রুত মর্যাদা দিতাম। কালকের ঐ কথাটা অতিরঞ্জন ছিল না আমার। এ পূজার মালা যে মাথায় তুলে রাখতে হয়।

হঠাৎ ঝর-ঝর করে কঁদে ফেলল মেয়েটা। কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল এভাবে ভেঙে পড়ায়। মুখটা মুছে বললে, আয়্যাম সরি!

—নাথিং টু বি সরি ফর! অশ্রুপাতের মধ্যে লজ্জা কী? ঘরে আলো নেই, নাহলে তুমি দেখতে পেতে আমারও দু-গালে নেমেছে অশ্রুর ধারা।

সুতনুকা সেই লবণাক্ত গালে চুমু খেল একটা।

পরদিন সন্ধ্যায় সরস্বতী-আম্মা একাই এল খাবারের থালা নিয়ে। বললে, ওর ‘শরীলটা’ খারাপ, পণ্ডিতজী জানতে চাইল আর কারেও পাঠায়ে দেবে?

—শরীর খারাপ? কী হয়েছে?

জ্ঞান হাসল জোগতি। বললে, সোমস্তু মেয়ের শরীল-খারাপের কথা কি জোয়ান মানুষের শুধাতে আছে সওদাগর?

—বুঝেছি। সে কি শয্যাশায়ী? একবার দেখা করা যায় না?

—না, না, বিছানা নেয়নি। মন-খারাপ। তাই.....। খালি কাঁদছে।

দেবদিন্দ্র আন্দাজ করতে পারে কান্নার মূল উৎসটা কোথায়। কাল উদ্ভেক্জনর মুহূর্তে সে তার মন উজ্জাড় করে দিয়েছিল ঐ হতভাগিনীর কাছে। সুতনুকা এই পাষণাকারা থেকে মুক্তি পেলে এই পিতৃপ্রত্যাখ্যাত জারজ সন্তানটি তার সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু ঐকে দিতে প্রস্তুত। সে কথাটা ও সইতে পারেনি। সইতে পারছে না। যে কারাজীবনকে এতদিনে মেনে নিয়েছিল, রাতারাতি তা দুর্বহ হয়ে পড়েছে তার কাছে। কেন বলতে গেল কথাটা? ফাঁসির আসামীকে কেন শোনাতে গেল মুক্তির মিথ্যা আশ্বাসবাণী?

বললে, খাবার তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও আম্মা। আমারও শরীরটা ভালো নেই। রাতে খাব না।

ভেবেছিল জোগতি প্রতিবাদ করবে। পীড়াপীড়ি করবে। তা কিন্তু করল না সে। নিঃশব্দে শুধু জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখে সে থালাটা উঠিয়ে নিয়ে ফিরে গেল।

দেবদিন্দ্র ফাইলটা টেনে নিয়ে বসল একটা ইজিচেয়ারে। বেড-ল্যাম্পটা জ্বলে নিল।

পড়াশুনা কিন্তু করা গেল না। অনতিবিলম্বেই হারের দিকে দৃষ্টি গেল তার।

সুতনুকা এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে একবিন্দু রক্ত নেই। একদিনে সে যেন কেমন হয়ে গেছে।

দেবদিন্দ্র ছুটে এসে ওর হাতটা তুলে নেয়, কী হয়েছে সু? তোমার অসুখ করেছে?

সূতনুকা ওকে সবলে আলিঙ্গন করে ধরল। ওর বুকে মুখ লুকিয়ে তার সে কী ফুলে ফুলে কান্না! দেবদ্বিম বী-হাত দিয়ে কবাটাটা ঠেলে দিল। ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে ওকে হাত ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে দিল পালঙ্কের উপর। বললে, বল, আমাকে সব কথা খুলে বল? এ শত্রুপূরীতে একমাত্র আমিই তো তোমার বন্ধু, সু?

সেটা সূতনুকাও জানে। আর তাই তো—আর কাউকে না জানিয়ে সে ওর কাছেই এসেছে।

সকালবেলাতেই তার সব কিছু বমি হয়ে যায়। মাস তিনেক ধরে ওর অভ্যস্ত জীবনে একটা মাসিক ছন্দপতনও ঘটছে। আশঙ্কা ছিলই। আজ সেই আশঙ্কাটা বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। অভিষেক-রাত্রির অভিশাপ সে বহন করছে জঠরে।

দেবদ্বিম ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সান্ত্বনা দেয়। শেষে প্রশ্ন করে বলে, তুমি কী চাও?

আমার চাওয়া-চাওয়ার প্রশ্ন উঠছে না। সহস্রাঙ্ক যা চাইবে তাই হবে। আমাকে সে গর্তপাতে বাধ্য করতে পারে। অথবা.....অথবা আমার সম্ভাবনের ভিতর সে একটি নতুন দেবদাসীর সম্ভাবনা দেখে আমাকে মা হবার সুযোগও দিতে পারে।

দেবদ্বিম চাপা গর্জন করে ওঠে, টু হেল উইথ সহস্রাঙ্ক। তুমি কী চাও?

সূতনুকা মুখ তুলে তাকায়। বলে, আমি যা চাই, তা দিতে পার?

—পারি। তুমি চেয়েই দেখ না?

—পেটে যেটা এসেছে সে তো কোনও অপরাধ করেনি, দেব! আমি সম্ভাবনাই চাই—কিন্তু ‘জন্মদাস’ সম্ভাবন নয়, মুক্ত পৃথিবীর মানুষ।

—তাই হবে, তবে সবার আগে একজন গাইনকলজিস্টকে দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করাতে হবে। তোমার আশঙ্কা অমূলকও তো হতে পারে!

—তেমন ভাগ্য করে আমি দুনিয়ায় আসিনি, দেব।

—ওসব ভাগ্য-ফাগ্য আমি মানি না। উই মাস্ট অ্যাক্ট। নাউ আর নেভার।

—ওরা তোমার কথা শুনেবে কেন? সহস্রাঙ্ক তোমাকে পাগুই দেবে না।

—সহস্রাঙ্কের বাপ দেবে।

তাই দিল। যদি অ্যাডভোকেট গণেশনকে তার আইন-বাপ বলা যায়।

প্রথমটা রুখে উঠেছিল সহস্রাঙ্ক। এসব ব্যাপারে সাংবাদিকটির নাক গলাবার কোনও অধিকার নেই। দেবদ্বিম তর্ক করেনি। বলেছিল, আমি এখন, এই মুহূর্তে ওকে মাদ্রাজে নিয়ে যাচ্ছি। ক্ষমতা থাকে আটকাও।

—ক্ষমতা নেই! তুমি ভেবেছ কী? সিংহের গুহায় ঢুকে তুমি সিংহকে ধমকাচ্ছ?

দেবদ্বিম বললে, গণেশনকে এখন টেলিফোনে পাওয়া যাবে? তোমার সিংহগর্জন

ধামিয়ে তাকে ফোন করে বরং জানাও। আমি অপেক্ষা করছি।

কথা হচ্ছিল মন্দিরের অফিস ঘরে। সহস্রাক্ষের সেক্রেটারিয়েট টেবিলে যথারীতি টেলিফোন আছে। মাদ্রাজ মাত্র দশ-মাইলের পথ। টোল কল। অচিরেই গণেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল। দেবদ্বি ওর হাত থেকে রিসিভারটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে, লুক হিয়ার মিস্টার গণেশন। আমি দেবদ্বি বলছি। সুতনুকা অসুস্থ। আমি তাকে মাদ্রাজের কোন ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে চাই। তোমার ক্লায়েন্ট বাধা দিচ্ছে। তাকে আইনানুগ পরামর্শ দাও।

গণেশন বললে, তার আগে অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবে কি—সুতনুকার শরীর নিয়ে তোমার কেন এত মাথাব্যথা?

—না, জানাব না। আর কোনও প্রশ্ন আছে?

—আরও একটা ছোট প্রশ্ন : আমরা রাজী না হলে তুমি কী করবে?

—তিনটে কাজ। এক : পুষ্পা নামের একটি এগারো বছরের মেয়ের বিষয়ে দুটো মামলা দায়ের করব। প্রথমটা অ্যাবডাকশন, দ্বিতীয়টা সর্দা আইনে। দুই : মল্লিকা-মার্জার কেস-এর ইনভেস্টিগেশন চালাব পত্রিকার তরফে। তিন : আদালত অবমাননার দায়ে তোমাকে ও তোমার স্টেনোকে অভিযুক্ত করব। নিশ্চয় মনে আছে—সাইন্ড শর্টহ্যান্ড নোটবইগুলো আছে আমার হেফাজতে। এনি মোর কোশ্চেন?

—নো থ্যাংক্‌স্। ফোনটা আমার ক্লায়েন্টকে দাও এবার।

ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে জানালেন, সুতনুকার আশঙ্কা অমূলক নয়।

চেষ্টার থেকে দেবদ্বি সোজা চলে এল মাদার অ্যাম্বুলিকার কাছে। চার্জে। বললে, একে আশ্রয় দিন। কারণটা ওর কাছেই গুনবেন। ভয় নেই। সহস্রাক্ষ বা গণেশন কিছু বলবে না। এখান থেকেই আমি বরং ফোনে ওদের দুজনকে জানিয়ে দিচ্ছি—আমার ইচ্ছানুসারে সুতনুকা এখন থেকে আপনার কাছেই থাকবে।

মাদার সবিস্ময়ে বলেন, কিন্তু আদালতের বিচারে যে স্থির হয়েছিল....

ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দেবদ্বি বলে, মাদার! আদালতের বিচারেই তো ওঁর ঐ দশা! তাকে আপনি 'বিচার' বলেন?

হাতটা তুলে ক্রুশবিন্দু যীসাস্-এর প্রাস্টার-কাস্টটাকে সে দেখিয়ে দেয়।

তারপর দু-দুটি বছর কেটে গেছে। এই দুই বছরের ভিতর অনেক অনেক কিছু বদলে গেছে দুনিয়ায়। খোকনকে গর্ভে নিয়ে যেদিন চার্জে এসে আশ্রয় নিয়েছিল সে দিনটি প্রায় দু বছরের অতীতকাল। মনে পড়ে প্রথম দিকের সেই ভুল বোঝাবুঝির কথা।

আদ্যোপান্ত সব কথা খুলে বলেছিল মাদারকে। রুদ্ধশ্বাসে সবটা শুনে তিনি কেমন

যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন। বললেন, তুমি কী করতে চাও?

—সেটা তো আপনি বলবেন, মাদার। দেব আমাকে ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল—আমি কী করতে চাই।

—কী বিষয়ে?

—আমার.....আমার গর্ভস্থ সন্তানের বিষয়ে—

মাদার চুপ করে গিয়েছিলেন।

পুরো তিনটি মিনিট নির্বাক-দৃষ্টিটা দূর দিগন্তের দিকে মেলে তিনি নিশ্চুপ বসে থাকেন।

সূতনুকা বুঝতে পারে মাদারের সমস্যার কথা। ট্রাডিশনের সঙ্গে প্রগতিশীল চিন্তাধারার সংঘাত। মাদারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—আকেশোর চার্চের শিক্ষানুসারে ভ্রূণহত্যা অপরাধ, পাপ। মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়েছে যে ভ্রূণ তাকে এ দুনিয়ায় আসতে দিতে হবে, তা সে যতই কেন না অব্যাহতীয় হোক সামাজিক বিচারে। কিন্তু সেই ট্রাডিশনাল নির্দেশটাই কি চরম সিদ্ধান্ত, পরম মঙ্গলময়? সূতনুকা যদি আজ সে পথেই চলতে চায়—একজন কামুকের পাপের শেষ ক্রেদচিহ্নটা ধুয়ে মুছে ফেলতে চায়, তাহলে তিনি তাকে বাধা দেবেন কোন্ মানবিক অধিকারে? আদালতের বিচারে স্থির হয়েছিল—সূতনুকা তার কাকা থিরুমলের সম্পত্তি। কাকা সেই পূর্ণযৌবনা ভাইঝিকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল চার্চের আশ্রয় থেকে, ভেট পাঠিয়েছিল নরখাদক ‘মিনেটর’-টাকে। মাদার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁকে আপীল করতে দেননি চীফ জাস্টিস জনসন। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—সেটা পশুশ্রম। গৃহবাসী ঐ মিনেটরকে নারী-মাসে যোগান দেওয়া নাকি আইন-মোতাবেক। রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্র, সমাজের জ্ঞানীশূণী পণ্ডিতেরা অনেক বিচার বিবেচনা করে রায় দিয়েছেন : মিনেটরকে তার খাদ্য যোগান দেওয়াটা আইনসম্মত। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। বোম্বাই থেকে এসে উদয় হল এক তরুণ সাংবাদিক : ‘নাইট ইরাস্ট।’ তার সর্বাস্ত্রে লৌহজালিক বর্ম.....সেটা তার শিক্ষা, বুদ্ধি, দুঃসাহস; তার কটিবন্ধে তরবারি নয়, বুকপকেটে গ্রথিত তার আয়ুধ mightier than sword। সে চিংকার করে উঠল, ‘তোমাদের ঐ আইন আমি মানি না। মিনেটরকে বধ করে অ্যারিআডনিকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব আমি।’.....কী দুঃসাহস! একা ঐ ছেলেটা প্রবেশ করল মিনেটরের গুহায়। তারপরে কী করে কী হল মাদার আন্দাজ করতে পারেন না—কিন্তু স্বচক্ষে দেখছেন সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে ছোকরা। এটুকু বুঝেছেন : ওরা দুজনে বাঁধা পড়ে গেছে কী এক অদৃশ্য, কিন্তু অচ্ছেদ্য বন্ধনে। অ্যারিআডনি’স প্লেড। নাইট ইরাস্ট অ্যান্ড হিজ লেডি-ইন্-ডিস্ট্রেস। এখন ওঁর চিন্তা : সেবদিন্ন কি সূতনুকাকে উদ্ধার করেই ক্ষান্ত হবে, অথবা তাকে আমন্ত্রণ জানাবে তার জীবনের ভোগে? নিশ্চয় জানাবে, কিন্তু কোন্ মূল্যে? সেবদিন্ন যদি দাবি করে বসে—

-ওদের আনন্দঘন দাম্পত্যজীবনের প্রবেশ পথে সে ঐ মূর্তিটাকে সহ্য করবে না—যে মূর্তিটা প্রতিনিয়ত সুখী দম্পতিকে স্বরণ করিয়ে দেবে একটি বিশেষ রাত্রির দুঃস্বপ্নের কথা : নারীত্বের চরম অবমাননা, গৃহস্থামিনীর একান্ত নির্যাতনের কথা ! দেবদ্বয়ের পক্ষে এ দাবি খুবই স্বাভাবিক। এবং সূতনুকার পক্ষেও। তাহলে মাদার কি আপত্তি জানাবেন ? বলবেন : এটা চার্চ-নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ। তোমরা যদি সেই সিদ্ধান্তই নিতে চাও তাহলে অন্যত্র চলে যাও। চার্চ-চৌহদ্দির ভিতর এ অনাচার আমি সহ্য না।

মাদারের নীরবতাকে সেদিন এই অর্থের গ্রহণ করেছিল সূতনুকা। স্নান হেসে বলেছিল, আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই, মাদার। একটা পাপ দিয়ে আর একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই না আমরা।

চমকে উঠেছিলেন মাদার : তার মানে ?

—যে প্রয়টা আমার কাছে সরাসরি পেশ করতে আপনার সম্মোহিত হচ্ছে সেটাই জানতে চেয়েছিল দেবদ্বিগ্ন : আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে চাই, ঐ অজ্ঞাত সত্ত্বানের বিষয়ে ?

কৌতূহলী এক জোড়া চোখ মেলে মাদার নীরবে অপেক্ষা করেন। প্রয়টা এবারও বাস্তব হবার অবকাশ পেল না।

সূতনুকা বলেছিল, পেটে যেটা এসেছে, সেটা তো কোনও অপরাধ করেনি মাদার।

—লর্ড ব্রেস্‌ য়, মাই চাইন্ড !—আবেগে জড়িয়ে ধরেন কন্যাপ্রতিম আশ্রিতাকে।

তার পরের কয়েকটা মাসের ইতিহাস গতানুগতিক। বিবাহিতা কন্যা গর্ভিণী অবস্থায় মায়ের কাছে ফিরে এলে মায়ের যে অবস্থা হয় মাদারের তখন সেই অবস্থা। এ ব্যাপারটার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। বইপত্র ঘাঁটাঘাটি করেন। সপ্তাহে-সপ্তাহে ওকে চেক-আপ করতে নিয়ে যান। তত্ত্বতালাশ নিতে থাকেন সকাল-সন্ধ্যা। ঔষধপত্র ঠিক মতো খাচ্ছে কি না, নিয়ম-মাফিক বাগানে পায়চারি করছে কি না।

চার্চের সকলেই জানে ভিতরের কথাটা। লুকোছাপা কিছু নেই। সূতনুকার সিদ্ধান্তে সকলেই অভিভূত। তার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলেনি কেউই—সেটাকে ঠিক সূক্ষ্মচিহ্ন মনে হয়নি ওদের—কিন্তু সবাই জানত, মাদার সুপিরিয়ার যে সিদ্ধান্তটা নিয়ে রেখেছেন : সন্তান জন্মানোর পর সদ্যোজাতকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে একটি অনাথ আশ্রমে। মাদ্রাজ শহরে নয়, অন্যত্র। কোথায়, সে-কথা মাদার কাউকে জানাননি, তথ্যটা অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে নাকি তাই করতে হয়। যাতে, যারা ভবিষ্যতে ঐ শিশুকে নেবে তারা না জানতে পারে শিশুটির পিতামাতার পরিচয়।

লীজা—মিস্‌ এলিজাবেথ রোজ—মানে মাদারের স্টেনোগ্রাফার, একবার একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছিল। লীজাকেই ডিক্টেশন দিতেন মাদার ; কিন্তু লীজা শুনত 'ডায়ার ম্যাডাম' থেকে—ঠিকানাটা কী তা সে জানত না। মাদার স্বহস্তে ঠিকানাটা লিখতেন, চিঠির মাথায়, খামের উপর। এতই গোপনীয়তা। সেই লীজা একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ দেবদাসী ৩৬

করে বলেছিল, কিন্তু ওটা করা কি ঠিক হবে মাদার?

—কোনটা লীজা?

—ঐ যে ব্যবস্থা আপনি করছেন। জন্মের পর সন্তানকে সূতনুকা একবার দেখতেও পাবে না; জানতেও পারবে না কী জন্মালো। ছেলে, না মেয়ে, অথবা স্টিলবর্ন।

—কতি কি? সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে দুঃস্বপ্ন বইতো নয়? ওর ঐ অবাস্তবীয় সন্তান ছেলে না মেয়ে এ প্রশ্ন ওর মনে জাগবেই না। সেটা না জানানোই তো মঙ্গল।

লীজা দু-দুটি সন্তানের জননী। মাদার অ্যান্জেলিকা আজন্মকুমারী : ভার্জিন। লীজা সসঙ্কোচে বলে, নয় মাস গর্ভ-ধারণের যন্ত্রণাটা তো স্বপ্ন নয়।

—নিশ্চয় নয়। কিন্তু তাই বলে কেন মনে করছ 'সু'-র মনে কোনও সফ্ট কর্নার আছে ঐ পাপের পিণ্ডটার জন্য। জীবহত্যা করতে চায় না বলেই সে না রাজী হয়েছে—

লীজা ইতস্তত করে বলে, আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন মাদার, কিন্তু চিঠিখানা ডাকে দেওয়ার আগে সূতনুকার সঙ্গে একবার কথা বলে নেওয়া উচিত নয় কি? মানে, সে কখন বাচ্চাটাকে দিয়ে দিতে প্রস্তুত। এমনও হতে পারে যে, ব্রেস্ট-ফিডিং পিরিয়ডেও হয়তো সে বাচ্চাটাকে নিচ্ছের কাছেই রাখতে চাইবে—

—ও চাইলেই তো হবে না। আমাদের মতামতটাও তো অগ্রাহ্য করতে পারে না সে। যত দেবী হবে ততই অপত্যস্নেহটা বৃদ্ধি পাবে। তখন তাকে ত্যাগ করা শক্ত হয়ে পড়বে। কী দরকার এ সবেল? যাকে চোখেই দেখেনি তার প্রতি মমতা জন্মানোর প্রায়ই ওঠে না।

দু-দুটি সন্তানের জননী ঐ বৃদ্ধা-কুমারীর কথার কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। বিস্ময়িত দৃষ্টি মেলে সে অপেক্ষা করে। মাদার একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ খোলাখুলি বল তো লীজা?

লীজা ধীরে ধীরে বলে, আমি আপনার যুক্তিটার কথাই ভাবছিলাম মাদার। এইমাত্র আপনি যে কথাটা বললেন : 'ও চাইলেই তো হবে না। আমাদের মতামতটাও ও অগ্রাহ্য করতে পারে না।'

—হ্যাঁ, এ কথাটায় তোমার আপত্তি কোথায়?

—আপত্তি কোথাও নেই, মাদার। আমি ভাবছিলাম, এ-কথাটা তো সু-ও বলতে পারে। আফটার অল, গর্ভ-ধারণের যন্ত্রণাটা তো সেই ভোগ করছে!

মাদার কয়েক সেকেন্ড নীরব রইলেন। তারপর বললেন, পার্‌হ্যাপ্‌স্‌ যু আর রাইট, মাই চাইন্ড! ঠিক আছে, সু-কে ডেকে নিয়ে এস।

লীজা ডেকে নিয়ে এসেছিল সূতনুকাকে।

মাদার ওকে খুলে বললেন সব কথা। তাঁর পরিকল্পনাটা। অনাথ আশ্রমের নামধাম গোপন রেখে। সূতনুকা হাসপাতালে ভর্তি হলে অনাথ আশ্রমের তরফে একটি দুর্ভবতী

ধাত্রী উপস্থিত হবে। সন্তান জন্মানোর পর সূতনুকা মুক্তি পাবে। তাকে শুধু জানানো হবে তার সন্তান সুস্থ আছে, নির্বিঘ্নে আছে। বাস্! আর কিছু নয়। এই ব্যবস্থাই করেছেন মাদার। এ বিষয়ে সু-র কি কিছু বক্তব্য আছে?

সূতনুকা দৃঢ়স্বরে বলেছিল, নিশ্চয়ই আছে। আমরা এ ব্যবস্থায় আদৌ রাজী নই।

—আমরা?

—আমি এবং সেব।

মাদার সবিস্ময়ে বলেন, সেবের সঙ্গে তোমার এ বিষয়ে কথা হয়েছে?

—নিশ্চয়। আমরা দুজনেই চাই শুকে আমাদের সংসারে মানুষ করতে। সেব সমাজের কাছে ঐ সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করতে সম্মত।

মাদার অভিভূত। লীজা কিন্তু বক্তব্যাত্মিক। জানতে চায়, সিদ্ধান্তটা তোমরা কবে নিয়েছ?

—যেদিন সেব আমার কাছে প্রপোজ করেছে, আমার গর্ভে সন্তান আসার পর।

—তাহলে তোমরা রেজিস্ট্রি মতে বিবাহও করেছ?

—না। এ রকম মানসিক অবস্থায় সেটা সম্ভব ছিল না। আর অত তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজনও ছিল না।

মাদার সায় দেন : ঠিক কথা।

লীজা প্রায় ধমকে ওঠে, আদৌ নয়! অত্যন্ত ভুল কথা।

মাদার চমকে ওঠেন। কী বলতে চাইছ, লীজা?

—আমি বলতে চাই, আজ থেকে বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে, যখন সু-র সন্তান কোনও বড় এম্ব্রিকিউটিভ বা সম্ভ্রান্ত ঘরের ঘরগী তখন যেন কোনও ব্ল্যাকমেইলার তার সঙ্গে দেখা করে না বলতে পারে যে, সে বাস্টার্ড! তার বাপ-মায়ের বিবাহ হয়েছিল তার জন্মের পর।

মাদার বলেন, কথাটা হয়তো ঠিক।

সূতনুকা বলে, এ সম্ভাবনার কথাও মনে হয়েছিল সেব-এর। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তাড়াহুড়া করে রেজিস্ট্রি বিবাহে সম্মত হয়নি। বলেছিল, বিবাহ-অনুষ্ঠানটা শুধুমাত্র আইনের আওতায় নয়, সামাজিক বা ধর্মীয় আওতায় নয়, মানব-জীবনে তার অন্য আবেদনও আছে। আমরা দুজনে যখন পরস্পরকে গ্রহণ করব তখন তার প্রেরণা শুধু জৈবিক বা আইন সংক্রান্ত হবে না।

—কিন্তু যে আশঙ্কার কথা আমি বললাম?

—হ্যাঁ। তার সহজ সরল সমাধান দাখিল করেছিল সেবদিন। ব্যাকডেটেড ম্যারেজ-রেকর্ড নয়; সে বলেছিল সন্তান একটু বড় হলে, তার জ্ঞানবুদ্ধি হলে, সেব সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলবে : জেনে রাখ, তুমি বাস্টার্ড! তোমার পিতৃপরিচয় নেই। লেঅনার্দো সেবদাসী ৩৮

দা ভিক্টর মতো!

লীজা বলে, লেঅনার্দোর বিষয়ে ইতিহাস সে-কথা বলে, কিন্তু তিনি নিজে কি স্বমুখে সে কথা বলতে পারতেন?

সুতনুকা লীজার চোখে চোখ রেখে জবাবে বলেছিল, জানি না, মিসেস্ রোজ। লেঅনার্দোকে আমি স্বচক্ষে দেখিনি। তিনি সমাজে কী পরিচয় দিতেন তা জানি না

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লীজা বলেছিল, লেঅনার্দো বিবাহ করেননি। শুধু সমাজকে নয়, কোনও কুমারীর পানিপ্রার্থী হয়েও তাঁকে পিতৃপরিচয় দিতে হয়নি। স্বীকার করতে হয়নি যে, তিনি বাস্টার্ড।

—সে কথাই আমি বলছিলাম। লেঅনার্দোকে আমি দেখিনি ; কিন্তু দেবদ্বন্দ্বকে দেখেছি। সে কিন্তু নিঃসঙ্কোচে সব কথা স্বীকার করেছে একটি কুমারী নারীর পানিপ্রার্থী হয়ে

—কী?

—যে দেবদ্বন্দ্ব একজন বাস্টার্ড। তার পিতৃপরিচয় নেই।



ওর জীবনে এর পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'সু-দেব'-এর জন্ম। সুদেব! নামটা দেবদ্বির দেওয়া। সুতনুকা আপত্তি জানিয়েছিল। বলেছিল, নামটার মধ্যে প্রকাশ একটা মিথ্যার ভেজাল রয়ে গেল যে, দেব। ঐ নামটা চলবে না।

হাসপাতালে শুয়ে ছিল সে। টুলটা টেনে নিয়ে তার মাথার কাছে বসে আছে দেবদ্বি। টেলিগ্রাফ পেয়ে সে উড়ে এসেছে বোম্বাই থেকে। সদ্যজন্মের মাথার চুলের ভিতর বিলি কাটতে কাটতে দেবদ্বি বলেছিল, ভুল বললে, সু! নামটার মধ্যে রয়ে গেল মিথ্যার বিরুদ্ধে একটা সোচ্চার প্রতিবাদ। ঐ নামটা চালানোই হবে আমাদের দাম্পত্যজীবনের ব্রত। রক্তশূন্য মুখে সাদাহাসি হেসে সদ্যজন্মী বলেছিল, তোমারই জিত হয়েছে বারে বারে। এবারেও তাই হল। ওর নাম সুদেবই রাখলাম।

ওর জীবনেই শুধু নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও একটা মস্ত বড় ঘটনা ঘটে গেল ওর সন্তানলাভের প্রায় সমসময়ে। দেবদাসী প্রথা লুপ্ত হল। প্রথমে মহীশূরে, তারপরে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ। Act No. V of '29-এর পরিপূরক Prevention of Dedication Act of '49.

দেবদাসীপ্রথা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হয়ে গেল ভারত ভূখণ্ড থেকে। কোনও সুতনুকাই আজ আর দেবদাসী নয়। কী আনন্দ! কী সাফল্য! ডক্টর মিসেস মুখলক্ষ্মী রেড্ডির ছবি ছাপা হল কাগজে কাগজে। এজন্য অচিরেই তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। দেবদ্বি যে কাগজের সাংবাদিক তারা ক্রোড়পত্র প্রকাশ করল। তাতে দেবদ্বি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছে। এক কপি কাগজ ডাক মারফত এল সুতনুকার কাছে। তিন চারখানি ছবিও ছাপা হয়েছে। একটা গ্রুপ ছবিতে রুস্তমী, কুশা, পুষ্পা, বাসবী আর সুতনুকা। আর একখানিতে দেবদ্বি কিছুটা পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে : সুতনুকার একটি ক্রোড়-আপ। নেপটিজম ঠিক বলা যায় না তাকে। ছবিটা সত্যি ভালো উঠেছিল। তাছাড়া দেবদ্বির সাবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গির কথা বাদ দিলেও নিঃসন্দেহে সুতনুকা ছিল ওদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। নিছক সাংবাদিক হিসাবেও দেবদ্বির পক্ষে ঐ ছবিখানাই বেছে নেবার কথা। অবশ্য কোনও ছবিতেই কারও নামোল্লেখ করা হয়নি। শুধুমাত্র দেবদাসী ৪০

বলা হয়েছে—মাদ্রাজ শহরের অনতিদূরে মহাবলীপুরমের কাছাকাছি ইয়েলাম্মা-মন্দিরের দেবদাসী ছিল এরা। হ্যাঁ, ছিল। আজ তারা মুক্ত। আইনটা পাশ হবার পর এরা কেউ আর দেবদাসী নয়, স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক! আদালত থেকে ছাপমারা মুক্তি-সনদ পেয়েছে প্রত্যেকটি মেয়ে, ব্যক্তিগতভাবে।

তা সেই স্বাধীন মেয়েগুলোর কী হল? কোথায় গেল তারা? এখন তারা কী করে? তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কী ব্যবস্থা হল? সূতনুকা ব্যগ্র হল জানতে। খোকনের বয়স মাত্র একমাস। ছয় সপ্তাহ পার না হলে তাকে চার্চের বাইরে যেতে বারণ করেছেন চিকিৎসক। না হলে সে বাসে চেপে চলে যেত ঠিক। ওর ভারি কৌতূহল হল জানতে—কী ভাবে ওরা আনন্দ উৎসবটা পালন করেছে।

এক বাড়িল গ্লিটিংস-কার্ড সে পাঠিয়ে দিল সকলের নামে নামে। কাউকে তামিলে, কাউকে তেলেগুতে। রুশ্বিণী ছিল ওর চেয়ে বয়সে বড়। একটু লেখাপড়া জানা মেয়ে। ম্যাট্রিক পাশ। তাকে লিখল ইংরেজিতে। সবাইকেই অভিনন্দন জানানো। অধিকাংশই নিরক্ষরা, তাই রুশ্বিণীকে লিখল ওর হয়ে সবাইকে অভিনন্দন জানানো।

অনেকেই জ্বাব দিল। তার ভিতর রুশ্বিণীর পত্রটিই দীর্ঘ। সে অনেক কিছু খবর জানিয়েছে। লিখেছে, ওদের কী অবস্থা হবে জানে না। আরও লিখেছে, দেবদাসী যদি তার সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে একটা সরেজমিন তদন্ত করে কাগজে ছাপে তাহলে উপকার হতে পারে। নানান কারণে ইয়েলাম্মা-মন্দিরটাই মাদ্রাজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। অদ্ভুত সব খবর :

কৈলাসনাথ, একাধ্বরেস্বর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, পেরুমল প্রভৃতি মন্দিরের দেবদাসীদের সাময়িকভাবে দিয়ে আসা হয়েছে মহাবলীপুরমের নিকটবর্তী ঐ ইয়েলাম্মা-মন্দিরে। ইতিপূর্বেই এখানে ছিল সতেরজন দেবদাসী। সংখ্যাটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে সাইত্রিশ। সমস্ত অঞ্চলের মুক্ত দেবদাসীদের কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে দুটি মন্দিরে—মাদ্রাজ শহরের মীনাক্ষী মন্দিরে এবং এখানকার ইয়েলাম্মা-মন্দিরে। এই দুটি কেন্দ্র থেকে ঐ দেবদাসীদের ধীরে ধীরে পুনর্বাসিত করা হবে। আদালত থেকে বিশেষভাবে নিযুক্ত অফিসার প্রতিটি মন্দিরে ঘুরে ঘুরে তদন্ত করছেন। প্রত্যেককে আদালতের সীলমোহরাঙ্কিত মুক্তিপত্র দিয়েছেন—যার বলে কেউ আর ওদের দেবদাসী বলে আটকাতে পারবে না। ইতিমধ্যে সহস্রাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন হয়েছিল। যার ফলে সরকার সহস্রাঙ্কের বিরুদ্ধে মামলা আনেন—অনেক, অনেকগুলি অভিযোগ ছিল তাতে। এ মামলায় হার হয়েছে সহস্রাঙ্কের। মাদ্রাজ হাইকোর্ট-এর রায়-মোতাবেক সরকার ইয়েলাম্মা-মন্দিরের মালিকানা অধিগ্রহণ করেছেন। মাদ্রাজ সরকারের মুখ্যসচিব অতঃপর একটি বোর্ড-অব-ট্রাস্টি নিয়োগ করে তার হাতে মন্দিরের মালিকানা অর্পণ করেছেন এবং তাঁরা আবার সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে একটি বোর্ড-অব-ডাইরেক্টারস্ নিয়োগ করলেন। তার

চেয়ারম্যান মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জাস্টিস্ বিনায়ক প্যাটেল।
সেক্রেটারী কাম-কন্ভেনার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তিরুপতি আয়্যাক্সার। মাদ্রাজের একটি
নামকরা কলেজে দর্শন পড়াতেন—স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-এর ছাত্র। অকৃতদার
উদারচেতা মানুষ। এছাড়া তিনজন সদস্য : একজন স্যোসাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের
ডেপুটি সেক্রেটারী, দ্বিতীয়জন জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত রঙ্গনাথন এবং তৃতীয়জন
হিন্দুমহাসভার উগ্রপন্থী সদস্য জগমোহনজী।

মামলায় হেরে সহস্রাক্ষ মন্দিরের চাবিকাঠি এবং যাবতীয় স্বাবর-অস্বাবর বুদ্ধিয়ে
দিয়ে গেছে প্রফেসর আয়্যাক্সারকে। চেলা-চামুণ্ডা সমেত লোকটা মন্দির চৌহদ্দির বাইরে
চলে যায়। আয়্যাক্সার এসে উঠলেন সহস্রাক্ষের ঘরখানাতে। তিনি অকৃতদার একা মানুষ।
মন্দিরেই থাকবেন। বদলে যেতে শুরু করল মন্দিরের আইন-কানুন। ভক্তেরা এখন আর
দেবী ইয়েলাম্মার প্রশামীর পরাংখানা লক্ষ্য করে দু-পাঁচটাকার নোট ছুঁড়ে দেবার অধিকার
থেকে বঞ্চিত হল। পরাংখানাই অপসারিত হল। তার বদলে এল সীলমোহর-করা
একটা কাঠের সিদ্ধুক। তার সামনের দিকটা মোটা কাচের। ইচ্ছামতো ওর ভিতর
প্রশামীর টাকা ফেলতে পার। মন্দিরের যারা কর্মী—ঝাড়ুদার, জমাদার, বিদমংগার,
দরোয়ান প্রত্যেকের মাহিনার স্কেল তৈরী হল। ফর্মাল নিয়োগপত্র দেওয়া হল তাদের।
এতদিন সহস্রাক্ষ তাদের মাহিনাবৃদ্ধি অথবা বরখাস্ত করত নিজের খেয়ালখুশি মতো ;
এখন থেকে তাদের সরকারী আইনানুগ নিয়মকানুনের আওতায় আনা হল। জোগতিদের
পেনশন দেবার ব্যবস্থা হল। মুশকিল বাধল দেবদাসীদের নিয়ে। তারা আইনানুগ যখন
দেবদাসী নয়, তখন নিয়োগপত্র দেওয়া চলে না।

তারা যায় কোথায় ?

বোর্ডের উগ্রপন্থী মেম্বার জগমোহনজী বললেন, চুলোয় যাক।

কিন্তু চুলেই বা পাওয়া যাবে কোথায় ? আর তাছাড়া ওভাবে এককথায় তাদের
তাড়িয়েও তো দেওয়া যায় না। শুধু ইয়েলাম্মা-মন্দির-এর আশেপাশের দু'চারটি মন্দির
থেকে দেবদাসীদের এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ; কারণ এ মন্দির সুরক্ষিত ; উঁচু
পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রাজ্ঞ এবং বিচক্ষণ মেম্বাররা প্রতিবাদ করেন, 'চুলোয় যাক' বললেই
তো হয় না। ওদের কী দোষ ? ওরা ছিল সামাজিক প্রথার শিকার।

বোর্ডের মিটিংয়ে আয়্যাক্সার পেশ করলেন তাঁর প্রস্তাব।

প্রথম কথা : ওরা মন্দির চৌহদ্দির ভিতর ঐ দেবদাসী নিকেতনেই থাকবে। মন্দিরের
রন্ধনশালা থেকে এতদিন যেমন ওদের আহ্বারাদি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল, সেটা বজায়
থাকবে। পোশাক-পরিচ্ছদ প্রয়োজন মতো সরবরাহ করা হবে। জগমোহনজীর প্রস্তাবটিও
গৃহীত হয়েছে ; ওদের যেসব স্বর্ণালঙ্কার আছে—সহস্রাক্ষের খেয়ালখুশি মতো যেসব
গহনা ওদের দেওয়া হয়েছে সেগুলি ওদের মন্দির তহবিলে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

নৃত্যগীতাদি কোন কাজই তাদের করতে হবে না, কিন্তু ওরা মন্দির চৌহদ্দির বাহিরেও যেতে পারবে না।

প্রতিটি আইটেম নিয়ে বোর্ড অর ডাইরেক্টোর্সের মিটিংয়ে ধূম তর্ক হল। জগমোহনজীর প্রশ্ন—ওরা যদি নাচগান না করে, কাজকর্ম না করে তবে বসে বসে অন্ন ধ্বংস করবে কেন? ওদের বিদায় করে দিতে আপত্তি কোথায়? কোথায় যাবে? তা নিয়ে আমাদের কেন মাথা ব্যথা? না হয় ওদের তিনমাস বা ছয় মাসের নোটিস দেওয়া হক। তার পর ওদের মন্দির ছেড়ে যেতে হবে।

কিন্তু বোর্ডের বাকি তিনজন সদস্যের তাতে ঘোরতর আপত্তি। এ তো অন্যায় কথা। ওরা নিজেরা কী ব্যবস্থা করতে পারে? ওরা দুনিয়ায় জানে কী, চেনে কাকে? জাস্টিস প্যাটেল বললেন, বিবেচনা করে দেখুন, ওরা জানে ফুলের মালা গাঁথতে, দেবমূর্তিকে চন্দনচর্চিত করতে, ভোগ-রাগ করতে, দেবতার নামে গাইতে-নাচতে। আমরা ওদের লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে বন্ধপরিকর, তাই এই কাজগুলি করতে দিচ্ছি না, সে ওদের অপরাধ নয়। ফলে ওরা বসে বসে মন্দিরের অন্নধ্বংস করছে এ অভিযোগ টেকে না।

জগমোহনজী বলেন, তাহলে আপনি কী করতে চান?

—প্রফেসার আয়াঙ্গার যে পরিকল্পনা করেছেন সে পথে চলি আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। ধীরে ধীরে এই মেয়েগুলিকে স্বাক্ষরী করে তুলতে হবে। ওদের লেখাপড়া শেখাতে হবে, নানান কাজকর্মের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের কীভাবে কর্ম সংস্থান করা যায় তাই আমাদের দেখতে হবে।

তাই হল। প্রথম দফায় সাতজনের ব্যবস্থা হল।

এদের ভিতর মাত্র দুজন, লছ্মী আর রুক্মিণী ম্যাট্রিক পাশ। সরকারী শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী জানালেন একটি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকার পদ খালি আছে। ম্যাট্রিক পাশ কোনও মহিলাপ্রার্থীকে নিয়োগ করা যাবে। গ্রামে থাকতে হবে। আবাসিক ব্যবস্থা। বোর্ড দুজনের মধ্যে লছ্মীকে বেছে নিলেন।

দুজনকে নার্সিং শিখতে পাঠানো হল। মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী জানালেন, ভেল্লোর মেডিক্যাল কলেজ দুটি আবাসিক ছাত্রীকে নার্সিং শেখানোর জন্য গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছে। ইংরেজি জানা হলে ভালো হয়, নিদেন তামিল ভাষা পড়তে পারা চাই।

গেল মেনকা আর চম্পা।

এছাড়া সমাজ কল্যাণ দপ্তর ব্যবস্থা করে চারজনকে পাঠিয়ে দিলেন একটি বেসরকারী নারী কল্যাণ সমিতিতে। সেখানে গিয়ে হস্টেলে থাকবে তারা। বয়ন, সীবন বা গ্রাম্যশিল্প শিখবে।

গেল : কৃষ্ণা, মালতী, কাবেরী আর রুক্মিণী।

—আর বাকি মেয়েগুলো?—জানতে চাইলেন জগমোহনজী।

—বাকিদের ব্যবস্থা এখনও কিছু করে উঠতে পারিনি।—সবিনয়ে জানালেন আয়াঙ্গার।

—এখনও পারেননি! কবে পারবেন? তাই তো জানতে চাইছি।

আয়াঙ্গার-সাহেব চোখ থেকে চশমাটা খুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলেন হিন্দুমহাসভার ঐ রাজনৈতিক কর্মীটির দিকে। বললেন, মিস্টার জগমোহন! আমি আমার সাধ্যমতো সাতজন পুনর্বাসনের আয়োজন করেছি। আপনিও কিছু রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে ওদের জন্য দু-চারটি চাকরির ব্যবস্থা করুন না। সবাই মিলে না করলে ...

জগমোহন ক্ষেপে ওঠেন, ঐ বেশ্যাগুলোর চাকরি দেওয়ার জন্য আমার তো রাতে ঘুম হচ্ছে না!

চেয়ারম্যান বাধা দিয়ে বলেন, এভাবে বলা ঠিক হচ্ছে না।

*

*

*

মোটকথা, আয়াঙ্গার-সাহেবের পরিকল্পনাটি ভালো, কিন্তু সেটা ওঁদের আপনানুরূপভাবে বাস্তবায়িত হলে না। লক্ষ্মী ফিরে এল মাসখানেক পরে। শিক্ষামন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারী একটি কনফিডেন্সিয়াল পত্রবোণে চেয়ারম্যান জাস্টিস্ প্যাটেলকে জানালেন, লক্ষ্মীকে চাকরিতে বহাল রাখা ওঁদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। কারণটা দুঃখজনক। পত্রের সঙ্গে আলপিন্ দিয়ে গাঁথা ছিল একটি গণ দরখাস্ত। যে গ্রামে লক্ষ্মী গিয়েছিল প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতে, সেই গ্রামবাসীদের গণ দরখাস্ত। তাতে বলা হয়েছে—

“সদাশয় সরকার বাহাদুর এমন একজন শিক্ষিকাকে প্রাইমারী স্কুলটিচার হিসাবে প্রেরণ করুন যার হাতে আমরা নির্ভয়ে আমাদের কিশোরমতি ছেলে মেয়েদের সঁপে দিতে পারি। সদাশয় সরকার বাহাদুর কোন্ আক্কেলে একটি ‘রন্ডি’কে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের গাঁয়ে? যতদিন এই দেহব্যবসায়ীটি ঐ স্কুলগৃহ থেকে বিতাড়িত না হচ্ছে ততদিন আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকছি, এই কথাটিই আপনার জ্ঞাতার্থে নিবেদন করছি। হৃদয় মালিক নিবেদন ইতি।”

নিচে সারি সারি স্বাক্ষর আর টিপছাপ।

দর্শনের অধ্যাপকটি সলজ্জে লক্ষ্মীকে বলেছিলেন : আয়াঙ্গার সারি লক্ষ্মী!

—নাথিং টু বি সারি ফর, স্যার। ওরা আমাকে পদচ্যুত করে না তাড়ালে আমি নিজেই রিজাইন দিয়ে ফিরে আসতাম।

—কেন? কেন? কী অসুবিধা হচ্ছিল সেখানে?

—ওরা আমাকে সারারাত ঘুমাতে দিত না, স্যার। তামাম রাত পালা করে জানলায় দেবদাসী ৪৪

টোকা দিত, দরজায় কড়া নাড়ত।

—কারা? কেন?—সবিস্ময়ে জানতে চেয়েছিলেন অকৃতদার অধ্যাপক আয়াদ্দার।

—কারা? ঐ যারা দরখাস্তে সই দিয়েছে, টিপছাপ দিয়েছে। গাঁয়ের পুরুষগুলো। আর কেন? সেটা স্যার, আপনাকে বোঝানো মুশকিল। ওরা যে জানে, সেহানই ছিল আমার জীবিকা।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের প্রত্যক্ষ শিষ্য এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাননি।



নার্সিং শিখতে যে দুজনকে পাঠিয়েছিলেন—মেনকা আর চম্পা—তারাও শিকলি কাটল। নিজেরাই ব্যবস্থা করে হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে গেছে। খবর পাওয়া গেল তারা 'বাঁধাবাবু' পেয়েছে। অর্থাৎ রক্ষিতার জীবন। চম্পার বাঁধাবাবু বিবাহিত, মেনকার বিপত্নীক।

কেমন যেন রোখ চেপে গিয়েছিল প্রাক্তন অধ্যাপক-মশায়ের। কেন এমন হয়? মানুষ কেন নিজের ভাল বোঝে না? কত ধরাধরি করে দুটি মেয়েকে পাঠালেন নার্সিং শিখতে, তারা ভদ্রভাবে বাঁচতে চাইল না। ডাইনে

বাঁয়ে তাকিয়ে দেখল না—সোজা নেমে গেল অধঃপাতের পথে।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে উনি দুজনের সঙ্গেই দেখা করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, কেন এই অধঃপতনের পথ বেছে নিল ওরা।

মেনকা থাকে চিঙ্গলপুটের দিকে। নতুন গড়ে ওঠা কলোনীতে। দুপুরের দিকে গিয়েছিলেন উনি। কড়া নাড়তে মেনকাই দরজা খুলে দিল। আপ্যায়ন করে বসালো বৃদ্ধকে। বললে, আপনি বসুন, আমি একটু শরবত বানিয়ে আনি।

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলেন, শরবত পান করার জন্য আমি এতটা রাস্তা আসিনি মেনকা। শরবতের দোকান অনেক ছিল পথে। আমি জানতে এসেছি—কেন? কেন? কেন?

মেনকা ঠুঁকে বুঝিয়ে শাস্ত করে। বলে, আমি নিজে হাতে মাইশোর পাক বানিয়েছি। ইড়লি-সম্বরম্ বানিয়েছি। আপনি যদি সেবা না করেন তবে আমি তো কোন কথাই বলব না, স্যার।

অগত্যা বৃদ্ধকে ফ্যানের তলায় বসে জিরিয়ে নিতে হয়, কলতলায় গিয়ে মুখে হাতে জল দিয়ে এসে মেনকার নিজে হাতে গড়া মিষ্টার সেবা করতে হয়। মেনকা সরাসরি দাখিল করে তার যুক্তি—আপনার আপত্তিটা কিসের? রক্ষিতার জীবনটা খারাপ হতে যাবে কেন?

—খারাপ নয়? এটা অধঃপতন নয়?

—কিসের তুলনায় খারাপ তাই তো জানতে চাইছি? কোন মাপকাটিতে অধঃপতন? ছিলাম সেবদাসী। পণ্ডিতজী আদেশ করত, জোগতির হাত ধরে সেজে শুজে কোনও ভক্তের ঘরে রাত কাটাতে যেতাম। লোকটাকে চিনি না, জানি না। যুবক-মধ্যবয়সী-বৃদ্ধ। নানান দেশের, নানান জাতের। এমন মানুষের সঙ্গে সারাটা রাত কাটাতে হয়েছে সেবদাসী ৪৬

যার ভাষা আমি বুঝি না, আমার ভাষা যে বোঝে না। একটা নিত্য জৈবিক বৃত্তি-
যা বিনা-ভাষায় বোঝা যায়—সেটাই ছিল তামাম রাত আমাদের যোগসূত্র। সে তুলনায়
এই বাধাবাবু তো স্বর্গ!

সরল বৃদ্ধের মুখটা বেদনার্ত হয়ে ওঠে। তবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তোমার যুক্তিটা
মানতে পারছি না, মেনকা-মা। তুমি কি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছ, না কি নিজেকে
নিজেই কৈফিয়ত দিচ্ছ? তোমার সেই ক্রদান্ত জীবন থেকে তুমি তো মুক্তি পেয়েছিলে!
পাওনি?

—কি জানি! হ্যাঁ, তা বটে। আদালত থেকে আমাকে ছাড়পত্র দিয়েছিল। আপনি
জানিয়ে দিয়েছিলেন—অতঃপর আমি গৌরবময়ী ভিক্ষাজীবী। আমাকে নাচতে হবে না,
গাইতে হবে না, অজানা-অচেনা পুরুষের বিছানায় শুতেও হবে না। বিনা পরিশ্রমে
আপনি আমাকে সেবাদাসী নিকেতনে থাকতে দেবেন, দুবেলা দু-মুঠো খেতেও দেবেন।

বৃদ্ধ বলেন, বুঝেছি। তুমি নিজের বিবেককেই বুঝ দিচ্ছ। তাই এভাবে নিজেকে
ভিক্ষাজীবী বলতে পারলে—

—ভিক্ষা নয়? আপনি আর আপনাদের বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সের মেম্বাররা
আমাদের ভিক্ষাজীবী করে তোলেননি?

—না। নিশ্চয় না। ভিক্ষাজীবী যাতে না হয়ে পড় সেজন্যই তোমাকে মেডিকেল
কলেজে পাঠানো হয়েছিল। নার্সিং শিখতে। সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার পথ দেখিয়ে
দিয়েছিলাম আমরা। তোমারই সেটা পছন্দ হল না। তুমি সেবাত্রতী হতে স্বীকৃত হলে
না।

—সেবাত্রতী, না পেটের ধান্দা? কোনটার তালে নার্সিং শিখতে পাঠিয়েছিলেন, স্যার?

—আমি যদি বলি দুটোই?

—তাহলে জবাবে বলব, দুটোই করায়ত্ত করেছি আমি। আপনি যে রাত্তাটা
বাংলেছিলেন তাতে স্বাবলম্বী হতে আমার দু'তিন বছর লাগার কথা। নার্সিং শেখা,
পাশ করা, চাকরি ধরা। তিন বছর পরে খাওয়া পরার চিন্তা ঘুচত। কিন্তু আমি যে শর্টকাট
পথে এখানে পৌঁছেছি সেখানেও আমার খাওয়া-পরার চিন্তা নেই। আর সেবা?
মাস্টারমশাই, বিশ্বাস করুন আমি সেবাদর্ম থেকে বিচ্যুত হইনি।

—সেবাদর্ম! মানে?

—গোপীনাথজীর সেবা! কায়মনবাক্যে!—

ডান হাতখানা তুলে সে দেখিয়ে দেয় সামনের কুলুসিতে ত্রিভঙ্গ মুরারীর মূর্তিখানি।
গলায় গোড়ে মালা, তার সামনে ধূপকাঠি তিল তিল করে নিঃশেষিত হচ্ছে।

আয়াদ্বারজী ধরতাইটা ধরতে পারছিলেন না।

—আপনাকে আর দুখানা ইডলি দিই?

—না না। আমার পেট ভরে গেছে। আর একটু জল দাও বরং।

তত্পাত্র থেকে জল গড়িয়ে মাস্টারমশায়ের ঘটিতে ঢেলে দিলে মেনকা। বলে, না স্যার, ঐ গোপীনাথজীর নাগাল আমি পাইনি। ঐ গোপীনাথজীর সেবা করা কি চাট্টিখানি কথা? আমি গোপীনাথ রাও-এর কথা বলছিলাম।

—কোন গোপীনাথ রাও?

—কী আশ্চর্য! জি. এন. রাও। যার বাড়ি খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছেন। যার বাড়িতে আপনি বসে আছেন। এ বাড়ির মালিক।

—ও। তার সেবা কর! সেই বড়ই করছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। সেই বড়ই করছি। কারণ আমি যে ভাবে তার সেবা করছি, করতে পারছি, তেমনভাবে সেবা করার অধিকার মাদ্রাজে খুব কম মেয়েরই আছে। অতি অল্পসংখ্যক মেয়েই তা পারত। পারবে।

—কী ভাবে?

মেনকা দৃষ্টিটা নত করল। একটু চিন্তা করল বোধহয়। তারপর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে পেলে বলল, ও এখন দপ্তরে গেছে। ওকে আপনি চেনেন না, চিনবেনও না কোনদিন। ওর কিছু গোপন কথা আপনাকে নিবেদন করছি। কথাগুলো গোপন রাখবেন।

আম্রাজ্ঞার বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, কী দরকার? থাক না—

—না, থাকবে না। আপনি জানলে এবং গোপন রাখলে তার কোনও ক্ষতি হবে না। গোপীনাথ দু—দুবার বিয়ে করেছে। দুটো বড়ই মারা গেছে। ওর বয়স বেয়ানিশ, আমার চেয়ে আঠারো বছরের বড়। ওর প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যায় টাইফয়েডে, আট বছর বিবাহিত জীবন কাটিয়ে। দ্বিতীয়া স্ত্রী পাঁচ বছর বিবাহিত জীবনান্তে আত্মহত্যা করে। আজ বছর তিনেক। গোপীনাথের তের বছরের বিবাহিত জীবনে দুই স্ত্রীর ভিতর কারও সন্তান হয়নি। ডাক্তারে বলেছে, ও নাকি বাবা হতে পারবে না কোনদিনই।.... আর সেইটাই ওর দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ। লোকটা রোজগার করে ভালই। দেখুন, ঘরে ফ্যান আছে, রেডিও আছে, খাট-পালং, লোহার আলমারি সবই আছে। অথচ ভোগ করতে পারে না। ওদের সমাজে কন্যাপণ নেওয়ার রেওয়াজ। ওর কাকা কোথা থেকে সম্বল ধরে আনল। এক কাঁড়ি টাকা দেবে আর সোমস্তু মেয়েকে দেবে তৃতীয়পক্ষের হাতে। মুখটা রাজী হল না। পাত্রীর বাবার কাছে স্বীকার করে বসল তার লজ্জাকর ইতিহাস—সে সন্তানের বাবা হওয়ার অনুপযুক্ত।.... বিশ্বাস করতে পারেন মাস্টারমশাই? পাত্রীর বাবা জবাবে বললে, তাতে কি? তোমরা বরং অনাথ আশ্রম থেকে একটি বাচ্চাকে নিয়ে এসে মানুষ কর।

—ঠিকই তো বলেছিলেন তিনি।

—না, ঠিক বলেননি। তা যদি ঠিক হত, তাহলে ওর দ্বিতীয়া স্ত্রী, রাধা, আত্মঘাতী দেবদাসী ৪৮

হত না। গোপীনাথ বছবার তার স্ত্রীকে সেকথা বলতে চেয়েছে কিন্তু সে সম্মত হয়নি। রাধা মা হতে চেয়েছিল—ধার করা সন্তান নয়, গর্ভে-ধারণ-করা সন্তান। বিশ্বাস করবেন স্যার, গোপীনাথ তারপর স্ত্রীকে বলেছিল—বেশ তো, তাই যদি চাও তবে তাই হোক। আমার বন্ধুবান্ধবদের তো দেখেছ, তোমারও বন্ধুবান্ধব কিছু আছে। বল, কার সন্তান তুমি গর্ভে ধারণ করতে চাও? আমি ব্যবস্থা করে দেব....

—তারপর?—অধ্যাপক আয়াদ্ভার প্রশ্ন করেন।

—রাধা জবাব দেয়নি। দুরন্ত অভিমানে সে বিছানা ছেড়ে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে দরজায় খিল দেয়। অনেক ডাকাডাকিতেও সে দোর খোলেনি। চিংকার চৈচামেচিতে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। সবাই মিলে দরজা ভেঙ্গে যখন ওরা ঘরে ঢোকে তখন রাধা দাউ দাউ করে জ্বলছে। তখন সে চিংকার করছে : বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।

আয়াদ্ভার ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলেন।

মেনকা বললে, মাস্টারমশাই। ওর সঙ্গে নিতান্ত ঘটনাচক্রে আমার আলাপ। ওর সব কথা ও আমাকে খুলে বলেছিল। তৃতীয়বার বিবাহ করবার হিম্মৎ অথবা ইচ্ছা কোনটাই ওর ছিল না। বাবা হওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও স্ত্রীকে তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা ওর আছে। প্রস-কোয়ার্টার্সে গিয়ে সাময়িক সাঙ্ঘনা পেতে পারত, রুচি হয়নি। এমন একটা অপূর্ণ মানুষকে আমি যদি সাঙ্ঘনা দিতে পারি, আর বিনিময়ে সে যদি আমার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়, তাহলে কোথায় আপনার আপত্তি? কেন তাহলে এটা আপনার মতে—অধঃপতন? কেন এটা আমার সেবার্ত্ত নয়?

—গোপীনাথ তোমাকে বিবাহ করলেই আর আপত্তি থাকে না।

—আপনার থাকে না। ওদের যে তাতেই আপত্তি। আমারও। ওর কাকা, খুড়তুতো ভাইয়েরা তেড়ে আসবে তাহলে। যেহেতু সেক্ষেত্রে গোপীনাথের সেহাঙ্গ হলে আমিই হব তার ওয়ারিশ।

—সে তো তোমাকে ওর সব সম্পত্তি উইল করেও দিতে পারে?

—না, পারে না। তার প্রভিডেন্ট-ফাণ্ডের নমিনি করতে পারে শুধু। তার বেশি নয়। ওদের পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ আমাকে দিতে পারে না।

—হঁ। বুঝলাম। আর তোমার আপত্তিটা কিসের?

—আমার আপত্তি এটাই যে, আমি তো ওর সম্পত্তির লোভে ওর ঘরে আসিনি। এসেছি ভালবেসে। একটা অপূর্ণ মানুষকে পূর্ণতার স্বাদ দিতে। আমি দেবদাসী। দেবতার সেবা করাই তো আমার ধর্ম। নিষ্কাম সেবা, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত। আমি মানুষ গোপীনাথের জন্য আজও মালা গাঁথি, ভোগ রাঁধি, আমি আজও ওর বিছানায় শুই। আমি যে মুখ্য সেবাদাসী। মূর্থ-দেবদাসী!

প্রফেসর আয়াদ্ভার বলতে সাহস পেলেন না যে, 'প্রিভেল্যান অব্ ডেডিকেশন অ্যাক্ট'

পাশ হয়ে গেছে। ডঃ মুখুলন্দ্রী রেড্ডি এখন ‘পদ্মভূষণ’। সেবতার কাছে আত্মসমর্পণ আইনত অপরাধ। ধর্মত পাপ।

চম্পার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হল বেশ একটু নাটকীয়। চম্পা যে ভদ্রালোকের রক্ষিতা হয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে তার নাম রাজেন্দ্রন্ এল. কান্নামান। এগমোর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে তার বাড়িতে যেতে হয়। আয়াক্সার তার ঠিকানা সংগ্রহ করে একখানা চিঠি লিখলেন চম্পা-মাসিকে। শনিবার বেলা চারটে নাগাদ তিনি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। অতদূর গিয়ে যাতে না দেখতে হয় সদর দরজায় তালা ঝুলছে। বিশেষ শনিবারের বিকাল।

আয়াক্সার-সাহেবের পরনে খেটো ধুতি, উন্টো দিকে পাট করা। গায়ে ফতুয়া, কাঁধে চাদর, কপালে ত্রিপুরক চিহ্ন, বগলে ছাতা। খুঁজে খুঁজে যখন পৌঁছালেন তখন সূর্যের তেজ কমে এসেছে। বাঁশবাত্যয় ছাওয়া একটি দোচালা বাড়ি। সামনে একটিলতে একটা বাগান। তাতে একসার নারকেল গাছ। দরজার কড়া নাড়তে যে ছেলেটি অর্গল উন্মোচন করে দিল, আয়াক্সার বুঝতে পারেন, সেই হচ্ছে গৃহস্থামী কান্নামান। বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স। নিজের বাড়িতেই সেজে শুজে বোধকরি ওঁর জন্য প্রতীক্ষা করছিল। ওঁকে দেখেই প্রশ্ন করে, প্রফেসর আয়াক্সার ?

উনি ভাল করে আত্মপরিচয় সেবার আগেই পিছন থেকে ছুটে আসে চম্পা। ওঁর হাত দুটি ধরে বারান্দায় উঠিয়ে নিয়ে যায়। বসিয়ে দেয় একটা মোড়ায়। এক বালতি জল, ঘাটি, তোয়ালে নিয়ে ছুটে আসে অতিথি সংকার করতে। আর কেটে-যাওয়া-রেকর্ডের মতো গৃহস্থামীকে এক নাগাড়ে তাগাদা দিতে থাকে— যাও, যাও, এক্ষণি বেরিয়ে পড়। মাস্টারজী তো এসেই গেছেন। এখনই বের হলে চারটে পঁয়ত্রিশের ট্রেনটা ধরতে পারবে—

রাজেন্দ্রন্ ওর পিছু পিছু ঘর-বার করছিল, আর ক্রমাগত প্রতিবাদ করছিল, না হয় পাঁচটা তেরোর গাড়িটাতেই যাব। মাস্টারজী এলেন, তাঁর সঙ্গে দুটো ভালোমন্দ কথাও হল না.....ওঁর মতো বিদ্বান, পণ্ডিত, প্রফেসর মানুষ.....

—কিন্তু উনি তো আমাদের ঘরের লোক। আবার আসবেন। না হয় আমরাই যাব একদিন ইয়েলাম্মা মন্দিরে...

—সে কথা নয়,.....আমরা তো যে কোন দিনই যেতে পারি...কিন্তু প্রফেসর আয়াক্সারের মতো মানুষ.....আমার মতো গরিবের বাড়ি—

—তুমি যাবে কি না?—মাজায় হাত দিয়ে সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো চম্পা, তার মরদের মুখোমুখি। লোকটা যেন কেঁচো হয়ে গেল।

আয়াক্সার এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন বারান্দার শেষপ্রান্তে একটি বেতের মোড়ায়।

দেবদাসী ৫০

সেখান থেকেই প্রস্থ করেন, কান্নামান্জীর কোথাও যাওয়ার কথা ছিল নাকি ?

—কান্নামান্জী মানে ? ও তো আপনার ছেলের বয়সী। ‘জী’ কিসের ?—এবার চম্পা তার মাস্টারজীর মুখোমুখি।

এবং এবার প্রফেসর আয়াক্সারই কৈচো হয়ে যান।

চম্পাবাই দুম্ দুম্ করে ঢুকে গেল ঘরে। ফিরে এল মুহূর্তে। তার এক হাতে একটা র্যাশন ব্যাগ, অপর হাতে একটি অ্যালুমিনিয়ামের কৌটা আর ছাতা। সব কিছু ধরিয়ে দেয় রাজেন্দ্র-এর হাতে। বলে, সোমবার ছটা আঠোরোর ট্রেনটা ধরবে, না হলে লেট হয়ে যাবে কিন্তু। আর এই অ্যালুমিনিয়ামের বয়ানে লাড্ডু আছে, দিদিকে বোলো, আমার নিজের হাতে গড়া, বাজারের নয়। লছমনও খেতে পারে।

কান্নামান্জী জবাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে ধামিয়ে দিয়ে চম্পাবাই ধম্কে ওঠে, আবার বক্ বক্। বাস্। কোনও কথা নয়। যাও, যাও, রওনা হও—

কান্নামান্জী কোনক্রমে বলে, না মানে আমার চম্পল—

পড়ি তো মরি ছুট লাগায় সে স্টেশান পানে।

চম্পাবাই এতক্ষণে অতিথি-সংকারে মন দেবার সময় পায়। পাদোদক, গামছা, হাতপাখা...

দম ফেলবার সময় পেয়ে আয়াক্সার সাহেব প্রস্থ করেন, ও কোথায় গেল ?

চম্পাবাই ততক্ষণে ঠাই করেছে। হাতপাখা নিয়ে বসেছে। মাস্টারমশাই আসছেন খবর পেয়ে সেও নিজেহাতে নানান খাবার বানিয়েছে। বলে, আপনি বসে পড়ুন স্যার। খেতে খেতে গল্প শুনবেন। ফেরার ট্রেন অনেকগুলো আছে। সাতটা বারো, সাতটা ছান্নামো...

আয়াক্সার বলেন, জানি। আমি লিখে এনেছি। কিন্তু কান্নামান্জীকে অমন তাড়াহুড়া করে কোথায় পাঠালে ?

—ওর বাড়ি। বউয়ের কাছে। ভেম্পুরে। মাইল পঞ্চাশ দূরে। সোমবার বেলা বারোটা থেকে ওর শিফট-ডিউটি। দুটো রাত থেকে আসুক বাড়িতে।

—ও। লছমন কার নাম ?

—আপনি কেমন করে জানলেন ? ওর ছোট ছেলে। ভারী পেটরোগা। দিদি বোচারি এমনিতে সূতিকার রুগী, হাড়িসার ; তার উপর ঐ পেটরোগা লছমনকে নিয়ে তার কী আতঙ্করী।

—ওর ক’টি সন্তান ?

—তিনটি। আর ভগবানকেও বলিহারী। পাঁচ বছর হল বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে তিন-তিনটে সন্তান। দিদি বোচারির কী দোষ বলুন ?

—তোমার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে ?

—না, আলাপ হয়নি, তবে চিঠিপত্রে যোগাযোগটা আছে। ওকে কতবার বলেছি, চল কোন এক শনি-রোববার, আমাকেও নিয়ে চল। ও সাহস পায় না। গ্রাম দেশ তো। ভেন্দুর-এর মানুষজন জানে না আমার কথা। আমাকে নিয়ে গেলে কী পরিচয় দেবে বলুন? লোকে তো বোঝে না?

—তা তো বটেই। তা ওর স্ত্রীকে তো এখানে নিয়ে আসতে পারে?

—আপনি কী যে বলেন মাস্টারসাব। দিদি তো একেবারে শয্যাশায়ী। তিন-তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে একেবারে নাছেহাল। আপনাকে আর একটু উপমা দিই...

বৃদ্ধ ব্যাঘ্র-ঝম্পনে বাধা দিলেন। এবং চম্পা ব্যাব্রিণী-ঝম্পনে ওঁর হাতটা সরিয়ে পাতে আরও কিছুটা উপমা ও লাড্ডু ঢেলে দিল।

—কেন দিলে এত? খেতে পারব না।

—খুব পারবেন। কতটা পথ যেতে হবে। তারপর? মন্দিরের কী খবর বলুন? রুশ্মিণী, কৃষ্ণা, পুষ্পা, ললিতা, সত্যভামা, মীরা—ওরা কেমন আছে? আর হ্যাঁ, মাস্টার সা-ব, মেনকাও নাকি হাসপাতাল থেকে ভেগেছে?

এতক্ষণে প্রসঙ্গে এসে পৌঁছেছেন। প্রশ্ন করেন, কেন, তুমি জান না?

—আমি তো আগে সটকেছি। কেমন করে জানব? কান্নাশ্রবণ বললে, তাই না শুনলাম সব কথা। মেনকাও নাকি সটকেছে?

—কান্নাশ্রবণ কেমন করে জানল?

—ঐ হাসপাতালেই লছমনকে দেখাতে নিয়ে গেছিল। সেখানেই তো আমার সঙ্গে ওর আলাপ। লছমনের আউট-ডোর টিকিট আছে। মাসে দু-একবার ওকে নিয়ে যেতে হয়। ক্লিনিক পেটের ব্যারাম। এবার ফিরে এসে বললে, তোমার সঙ্গে আর একটি যে দেবদাসী হাসপাতালে নার্সিং শিখতে এসেছিল সেও নাকি হস্টেল ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই সেই রাও-সা-ব। মেনকার সঙ্গে তার খুব শুজুর-শুজুর ফুসুর-ফুসুর আমি তো স্বচক্ষেই দেখে এসেছি।

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ, চম্পা। মেনকা সেই গোপীনাথ রাও-এর সঙ্গে থাকে আজকাল। লোকটা বিপত্নীক। তাই কোনও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তুমি কেমন করে...।

—কী? কী কেমন করে?

—মানে, ইয়ে...কান্নাশ্রবণ যে বিবাহিত। তার স্ত্রী আছে।

—তাই কী?...ও। বুঝেছি। কিন্তু ওটাও আপনার ভুল ধারণা মাস্টারসা-ব। আমি ওদের সংসারে ভাঙন ধরতে আসিনি। ওর বউ আমাকে যে চিঠি লিখেছে দেখবেন?

—না থাক। তুমি মুখেই বল।

—দিদি বৈঁচে গেছে আমি ওর দায়িত্ব নেওয়ায়। প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছে আমাকে।

ছোট বোন বলে মেনে নিয়েছে।

—আশ্চর্য। এমনটা তো হবার কথা নয়।

—আপনি বুঝছেন না। পাঁচ বছরে বেচারির তিন তিনটে বাচ্চা। মাঝে একটা খসেছে। আর কত সময় বলুন? তিনটে বাচ্চাই হাড়িসার। শেষেরটা তো এক ফোঁটা বুকের দুধ পায় নি। এদিকে কান্নামান জোয়ান মরদ। দিদির ডায় ধরেছিল ও আর একটা বিয়ে করে বসবে। ন্যায়ত, ধর্মত তা সে করতে পারে। সমাজ বা আইন আদালত ওকে রুখতে পারে না। কান্নামান সে পথে যায়নি। সে যেতে শুরু করেছিল ঐ লালবাতিজ্বালা চাকলাটায়। কিন্তু কেশ্যাপাড়ায় নিতি যাতায়াত করলে অসুখ বাধবে নির্ধাৎ। দিদি ওকে বারণ করতে পারে না। যেতেও বলতে পারে না। সে যে কী আতাত্তরী। এদিকে ও যদি আর একটা বিয়ে করে এখানে নতুন বউ পোষে তাহলেও দিদির সর্বনাশ। তিন-তিনটে কাছাবাচ্চা নিয়ে ভেসে যেতে হবে। খুদকুঁড়ে যেটুকু আছে তার ভাগ বসাবে সর্তীন পোরা—

অধ্যাপক আত্মসার বা জ্ঞানতে এসেছিলেন তা জ্ঞানা হয়ে গেছে। মেনকা ধীর, স্থির আর চম্পা মুখরা। তার শিক্ষা-দীক্ষাও কম। সে সোজা কথা সহজ করেই বোঝে, মেনকার মতো তার্কিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না। তাই আত্মসার গুর কাছে এবার জ্ঞানতে চাইলেন না—কেন সে নার্সিং-শিক্ষার্থীর বৃত্তি ত্যাগ করে এসে উঠেছে এই কান্নামানের ফুটোচাল ভাঙ্গ ঘরে। তিনি বরং অন্য এক জাতের প্রশ্ন পেশ করলেন : কিন্তু তোমারও তো সন্তানাদি হতে পারে চম্পা-মা?

—আপনি একেবারে ছেলেমানুষ মাস্টার-সাব। জীবনভর শুধু ছেলে পড়িয়েছেন। দুনিয়াদারীর কিছু জ্ঞানেন না। দেবদাসীরা অনেক তুকতাক জ্ঞানে, শোনেননি? তাদের ছেলেপিলে সহজে হয় না। আর নেহাৎ যদি আমার বাচ্চা হয়েই পড়ে, সে তো জারজ। সে কি কোনদিন লছমনের হিসসার ভাগিদার হতে পারে?

তা বটে।



যে চারজনকে পাঠিয়েছিলেন গ্রাম্য-শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারির সুপারিশ মতো কোন এক অবলা-আশ্রমে, তাদের মধ্যে তিন-তিনজন শিকল কেটে উড়ল। ফিরে এল মাত্র একজন, কাবেরী। খবর পাওয়া গেল, মালতী আর কৃষ্ণ সরাসরি গিয়ে নাম লিখিয়েছে মাদ্রাজের লালবাতিজ্বলা চত্বরটায়। বাড়িউলি-মাসিরা তাদের অতি সযত্নে বরণ করে ঘরে তুলেছে। বেবুশ্যো নয়, প্রাক্তন দেবদাসী। সোজা কতা? কী তাদের বাজারদর! নাচতে জানে, গাইতে জানে, জানে পরিশীলিত প্রক্রিয়ায় সেবায়ত্ত। কী চাও?

ভারতনাট্যম? কথাকলি? কুচিপুড়ি? ফেল কড়ি—সব পাবে। কড়ি ফেলবার হিন্দুং যদি থাকে তবেই ঐ পর্দাফেলা ঘরের দিকে ঠ্যাঙ-জোড়া বাড়িও। নচেৎ সোঁদোও গিয়ে ঐ খোঁসি, বুঁচি, ধুমসো মাগীদের ঘরে।

মালতী, কৃষ্ণ, রুক্মিণী আর কাবেরী। ওদের মধ্যে বয়ঃজ্যোষ্ঠা রুক্মিণী, সে খ্রিশ ছুই ছুই—সর্বকনিষ্ঠা কাবেরী, তার সতের চলছে। মাথুর সাহেবের ড্রাইভার ইসমাইল তাই যোগাযোগ করেছিল সর্বজ্যোষ্ঠা রুক্মিণীর সঙ্গে। রুক্মিণীর ব্যবস্থাপনায় দুজন ভাগল ইসমাইলের সঙ্গে : মালতী আর কৃষ্ণ। নাম লেখালো বাড়িউলির খাতায়। সে নিজে কিন্তু গেল না। দুঃসাহসী মেয়েটা একা রওনা হয়ে গেল অতি দূর দেশে। মাদ্রাজ কন্দরে গিয়ে জাহাজে চাপল। তার গন্তব্যস্থল কেলুচিস্তান—এডেন কন্দর হয়ে। সেখানে নাকি মেয়ের অভাব। শোন কতা! মেয়েমানুষের আবার আকাল হয় নাকি? মা যতীর কৃপায় বছর বছর তো মেয়ের দলই আসে মায়ের কোল জুড়ে। গণ্ডায় গণ্ডায়। কিন্তু না। ইসমাইল-ভাই বলেছিল—তেমনটি নাকি হবার জো নেই কেলুচিস্তানে। খোদাতালার মর্জি অনুসারে সেখানে দুটো মরদ পয়দা হলে একটা জন্মায় ঔরং। কী কাণ্ড! হিসাব জুড়ে দেখ—বিশ-তিশ সাল বাদে তামাম মুলুকটার কী হাল হবে। মেয়ের আকাল হবে না?

মালতী আর কৃষ্ণ পৈ পৈ করে বারণ করেছিল : রুক্মিণীদি। এমন কাণ্ড করবেন না। বিদেশে কিছুই জায়গা, হয়তো তাদের কথাই বুঝবেন না। অথাদ্য কুখাদ্য খেতে হবে। ঠাকুর দেবতার মন্দির মাথা কুটলেও পাবেন না।

রুক্মিণী শোনেনি। মেয়েটা চিরকালই ছিল ডাকাবুকো। বলেছিল, আর যাই করি কৃষ্ণ, ঠাকুর-দেবতার মন্দিরে কোনদিন মাথা কুটতে চাইবে না তাদের রুক্মিণীদি।
দেবদাসী ৫৪

অনেক অনেকবার মাথা কুটেছি। হয় লোকটা কালা, নয় ঠুটো।

—লোকটা? কোন লোকটা?

—ঐ তোরা যাকে ভগবান বলিস।

রুস্বিগী ইসমাইলের হাত ধরে চলে গেল জাহাজঘাটার দিকে। যাবার আগে ব্যবস্থা করে গেল মালতী আর কৃষ্ণার। ওরা দুজনে গিয়ে নাম লেখালো ‘প্রস্টিটিউশান প্রফেশন’-এর খাতায়। বংশে বাতি দিতে বাকি থাকল—কাবেরী। রুস্বিগী তাকে ফিরে যেতে বলল ইয়েলান্মা মন্দিরে।

কাবেরী প্রথমটায় রাজী হয়নি। বলেছিল, কেন রুস্বিগীদি? আমিও যাই না কৃষ্ণাদিসের সঙ্গে?

—না। তুই মাস্টারসা’ব-এর কাছে ফিরে যা। সেখানে দিন পনের অপেক্ষা করিস। আমি কৃষ্ণা আর মালতীকে দু-খানা পোস্টকার্ড দিয়েছি। বলেছি, তোকে চিঠি দিয়ে জানানতে—ঐ বাড়িউলি-মাসি লোকটা ওদের কেমন ভাবে রেখেছে, কথার খেলাপ করছে কি না। সে চিঠি পেলে তুই ওদের জবাব দিস। ইসমাইল গিয়ে তোকে নিয়ে আসবে।

হারাদনের শেষ সন্তান কাবেরী বাসে চেপে ফিরে এল ইয়েলান্মা মন্দিরে।

প্রফেসর আয়্যাক্সার তাকে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ইতিমধ্যেই অনাথ-আশ্রমের ম্যানেজারের চিঠিতে তিনি জেনেছিলেন যে, ওরা আশ্রম ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বললেন, তুমিই বা ফিরে এলে কেন? বাড়িউলি-মাসির খাতায় নাম লেখালেই পারতে। তোমরা...তোমরা সবাই নেমকহারাম।

কাবেরী নতমস্তকে ভর্ৎসনাটা স্বীকার করে হাতটা বাড়িয়ে দিল পদধূলি নিতে।

আয়্যাক্সার শব্দকবুজিতে ঠ্যাঙজোড়া গুটিয়ে নিলেন। বাবু হয়ে বসলেন গদিতে। সোজা উঠে বসে বলেন, কী হল? জবাব দাও? তুমিই বা ফিরে এলে কেন? বাড়িউলি-মাসি তোমাকে নিতে রাজী হল না?

আয়্যাক্স একজোড়া সূর্য-আঁকা চোখ মেলে এবার তাকালো। বলল, জী না। আমাকেও ঐ একই শর্তে নিতে তিনি রাজী ছিলেন।

—শর্ত। শর্ত আবার কিসের?

—আলাদা একখানা ঘর পাব, সিলিঙ ফ্যান, হুণ্ডায় একদিন ছুটি, মাসে আটচল্লিশ টাকা বেতন আর তিনানা কমিশন।

—‘তিনানা কমিশন’! মানে?

—মানে মরদ-পিছু যা আদায় হবে তার তেরআনা বাড়িউলি-মাসির, আর...

—থাক। বুঝেছি। তাহলে তুমি ফিরে এলে যে হঠাৎ?

—রুস্বিগীদি যে তাই বলল। বলল, আপনাকে এই চিঠিখানা দিতে। পড়ে দেখুন।

আমি এখানে বেশি দিন থাকব না স্যার। ধরুন দিনপনের। কৃষ্ণাদিদের চিঠি পেলেই...

—কৃষ্ণাদির চিঠি। কী চিঠি?

—রুশ্বিগীদি আপনাকে যে চিঠিখানা লিখেছে সেটা আগে পড়ুন।

কাবেরীকে ভিতর বাড়িতে পাঠিয়ে তিনি উঠে গেলেন নিজের ঘরে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসলেন রুশ্বিগীর দীর্ঘ পত্রখানি নিয়ে। আট-সশ পৃষ্ঠা। দীর্ঘ পত্র। বর্ণাশুদ্ধি অনেক আছে। হাতের লেখা কাঁচা। শুছিয়ে সব কথা হয়তো বলতে পারেনি। কিন্তু অধ্যাপক আশ্বাসারের মনে হল, ঐ ভুলে-ভরা পত্রের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে এক বিদ্রোহিণী।

ওদের চারজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মাদ্রাজ শহরের মাইল ত্রিশেক উত্তরে সমুদ্রের ধারে একখানি গ্রামে। একদিকে বাদশাহী সড়ক, অপরদিকে নারিকেল ছায়ায় বিকৃত তরঙ্গ-মালা সমবিত সাগর। তার মাঝখানে বিবে ত্রিশ-চব্বিশ জমি ঘিরে গড়ে উঠেছে একটি আশ্রম; নারী কল্যাণ সমিতি। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। জনৈক ধনকুবের প্রতিষ্ঠিত। হয়তো কিছু 'পূন' সক্ষম করতে চেয়েছিলেন তিনি। ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলে ডান-হাতে অফিস ঘর, বাঁয়ে গেস্ট হাউস। একটু ভিতরে একটি দ্বিতল বাড়ি। মাঝখানে সিঁড়ি; তার এক এক পাশে এক একটি হল-কামরা। একতলা-দোতলা মিলিয়ে চারটি ঘরে চার-বারো আটচল্লিশটি শয্যা। এরা সবাই সমাজতান্ত্রিক। কিছু দূরে দূরে কটেক বাড়ি। কাক্সা বাচ্চা আছে বাদের, তারা সেখানে থাকে। এখানে-ওখানে অনেকগুলি শেড। নানান মাপের। সেখানে নানান গ্রামীণ শিল্প শেখানোর আয়োজন। কোথাও তাঁত শিল্প চলে, কোথাও চরকায় সুতো কাটা হয়, কোথাও বা নারকেল ছোবড়া বা নারকেল পাতা দিয়ে গ্রামীণ শিল্পের আয়োজন : দড়ি, পাপোশ, মাদুর, হাত পাখা। দ্বিতলবাড়ির পিছনে পাকশালা ও ডাইনিং-হল। মেয়েরা নিজেরাই পালা করে রান্না করে, পরিবেশন করে।

ওদের চারজনকে যেদিন পৌঁছে দিয়ে গেল, সেদিন সন্ধ্যায় ডাক পড়েছিল রুশ্বিগীর। ঐ ম্যানেজারের ঘরে। ম্যানেজারের বাড়িটা প্রথমে নজরে পড়েনি। সেটা একটু দূরে। সমুদ্রের মুখোমুখি, বালিয়াড়ির মাথায়। ভদ্রলোক মাঝবয়সী, চল্লিশের উপর, পঞ্চাশের নিচে। একা থাকে। চাকর-বাকর নিয়ে। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, মাথার চুল কাঁচাপাকা, মায় পুরুষ্ট গৌণ জোড়াও। কপালে ভস্মের ত্রিকলী। গায়ে ফতুয়া। আধ শোয়া হয়ে শুয়েছিলেন গদিতে। গদিটা প্রায় ঘর জোড়া। ঘরে আরও দুটি মেয়ে উপস্থিত ছিল। একজন শূঁর পা টিপে দিচ্ছিল, একজন বাতাস করছিল। ম্যানেজারের সামনে একটা কাঁচকড়ার প্লেটে কিছু ভাজি, তাঁর হাতে গ্লাস, সামনে ছইকির বোতল। যে চাকরটা চর্চ ছেলে পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছিল সে পর্দাটা তুলে ধরে তামিল ভাষায় বললে, নিয়ে এসেছি স্যার, একেই তো?

ম্যানেজার ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে রুশ্বিগীকে একবার সেখেই খেঁকিয়ে শুঠেন, দেবদাসী ৫৬

শুয়োরের বাচ্চাটার বুদ্ধি দেখ। একে ডেকেছি আমি? কী বললাম তোকে? রুক্মিণি। সেই যে মেয়েটার চিবুকে একটা তিল আছে, বছর ধোলা-সতের বয়স, আজ ঝোঁয়াড়ে ভর্তি হল। এর বয়স কি সতের? হারামজাদা।

লোকটা কিছু বলবার আগেই রুক্মিণী বলে, আপনার ভুল হচ্ছে। যার চিবুকে তিল আছে, তার নাম রুক্মিণী নয়...

—অ! তবে তার নাম কী?

—বরং ছেনে রাখুন, যার চিবুকে তিল নেই এবং আজ আপনার ঝোঁয়াড়ে ভর্তি হল তার নাম রুক্মিণী। আমিই।

লোকটা ঘোলাটে চোখ দুটি মেলে শুকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিল। তারপর একমুখ পান করে বাঁ-হাতের তেলোতে মুখটা মুছে বলল, ঠিক হ্যাঁ। তোমাকে দিয়েই চলবে। তিল-গুলালীর পাশ্চ কাল নেওয়া যাবে। কস দিকিনি।

*

*

*

রুক্মিণী যখন হস্টেলে ফিরে এল রাত তখন এগারটা। সেই চাকরটাই টর্চ জ্বলে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিল শুকে। কাবেরী ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বাঁ-হাতটায় ঢাকা পড়েছে চিবুকের সেই তিলচিহ্নটা। কিন্তু কৃষ্ণা আর মালতী জেগে অপেক্ষা করছিল। ঘরের অন্যান্য আবাসিকাদের কেউ কেউ জেগে ছিল। তারা কোনও কৌতূহল দেখালো না। রুক্মিণী গামছা, আটপোরে শাড়ি-সাদা নিয়ে বাথরুমের দিকে গেল। মিনিট পনের পরে ফিরে এসে যখন নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল তখন পাশের বিছানা থেকে কৃষ্ণা ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করে : ম্যানেজার কি একা ছিল ঘরে?

—না। আরও দুজন ছিল।

—তিন-তিনটে মিন্‌সে। বলিস কি রে।

—না, বাকি দুজন মেয়েছেলে। উপরের ঘরে থাকে। এই হস্টেলেই।

কৃষ্ণা একটু অবাক হয়। এমনটাও হয় নাকি? ওর ঠিক ধারণা নেই। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, একের পর এক?

—নাঃ।

কৃষ্ণা আর কথা বাড়ায়নি। ইয়েলাম্মা মন্দিরে কোনও অতিথিকে পরিচর্যা করতে একের বেশি দেবদাসী কখনও গেছে বলে শোনেনি। এক ঘরে একটি পুরুষ আর তিন-তিনটি রমণী...

কৃষ্ণার কৌতূহল অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টা পরেই নিবৃত্ত হয়েছিল।

দুচার দিনেই বোঝা গেল পরিকল্পনাটা। ম্যানেজারের ব্যবস্থাটি পরিপাটি। লোকটা বিবাহিত। দেশে ঘরে ছেলেপিলেও আছে। দেশে যেতে চায় না। ম্যানেজার হিসাবে যা মাহিনা পায় তার তিনগুণ রোজগার করে, উপরি। মাদ্রাজ থেকে কাস্টেনবাবুরা

আসেন। রাতটা কাটিয়ে যান অতিথিশালায়। আবাসিক মেয়েদের ডাক পড়ে। মাঝে মাঝে গণ্ডগোল হয়। পুলিশ এনকোয়ারি হয়। একই কায়দায় ম্যানেজার চাপা দেয় এনকোয়ারিটা। পুলিশ-অফিসার ধমক-ধামক দিয়ে ফিরে যায় : এবারকার মত ছেড়ে দিলাম। এসব বাড়াবাড়ি আর যেন না হয়।

ঐ এক কাস্টেন দলের ড্রাইভার, ইসমাইলই প্রথম প্রস্তাবটা তুলেছিল রুশ্বিগীর কাছে। চারজনের মধ্যে তাকেই সে দলনেত্রী বলে কী-জানি কী-করে চিনে নিয়েছিল। তার প্রস্তাবটা সরল : যৌবন কারও চিরদিন থাকে না। এখানে কেন সময় নষ্ট করবে ওরা চারজন—বেহেশ্তের স্বরী। ইসমাইল বাড়িউলি-মাসিদের দালাল। এরা চাইলে সে ব্যবস্থা করে দেবে। এখানে ওরা যা করছে, তার বেশি কিছু করতে হবে না। কিন্তু এ রকম জেলখানার ওয়ার্ডের মতো ব্যবস্থা নয় সেখানে। ওদের রাখা হবে রাস্তার হালে। চারজনের চারখানা পৃথক পৃথক কামরা, মাথার উপর সিলিং ফ্যান, গদি-আটা পালঙ, আলমারি, খুটো মুন্ডোর গয়না, হস্তায় বারোটাকা মজুরি আর তিনানা কমিশন।

—ধর যদি জ্বর-জ্বর হয়? শরীর খারাপ লাগে? লোক বসাতে না পারি?

—আপনার আটচল্লিশ টাকা মাস মাহিনায় তো হাত পড়বে না। এ ছাড়া মাসে চারদিন ছুটি, পিকচারের টিকিট...

—চারটে রোক্বার লোক বসাতে হবে না?

—রোক্বার নয়, বেস্পতিবার। রোক্বার ভীড়টা একটু বেশি হয়।

রুশ্বিগী বলেছিল, ঠিক আছে। পরের সপ্তাহে জানাবো, বাকি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে।

সাতদিনের মাথায় ইসমাইল এসে হাজির।

বহিরাগতর সঙ্গে দেখা করা এক মহা বখেড়ার ব্যাপার। ম্যানেজারকে সতর্ক হতেই হয়েছে। খবরের কাগজের বাবুদের তার সবচেয়ে ভয়। পুলিশ পর্যন্ত পোষ মানে, টাকায় অথবা ইয়ে-তে ; কিন্তু ঐ কাগজের রিপোর্টারগুলো কাঁচা-খেকো দেবতা। সেবার একটা আত্মহত্যার কেস নিয়ে সে কী ঝামেলা।

অবশ্য ইসমাইলকে খুব কিছুটা বেগ পেতে হয়নি। মুনিমজী তাকে চেনে মাথুর সাহেবের ড্রাইভার বলে। মাথুর প্রায়ই আসেন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে। মুনিমজী ছাড়পত্র দিলেন ইসমাইলকে। তা বলে তাকে ভিতরে ঢুকতে দিলেন না। একটি ভৃত্যকে ম্রিপ দিয়ে ভিতরে পাঠালেন রুশ্বিগী দেইকে ডেকে পাঠিয়ে।

রুশ্বিগী এসে পৌঁছালে ইসমাইল তাকে লম্বা সেলাম করল।

পায়ে পায়ে ওরা বার হয়ে এল অফিস ঘর ছেড়ে। সামনেই একটা কদমগাছ, আশ্রম চৌহদ্দির ভিতরেই। তার নিচেটা সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। ওরা গিয়ে বসল সেখানে। ভূমিকা বাদ দিয়ে ইসমাইল বললে, বলুন বড়দি, কী স্থির করলেন?

—দু-জন রাজী হয়েছে আপাতত।

—কোন দুজন?

—বলছি। তুমি বাড়িউলির নাম আর ঠিকানাটা বল আগে।

ইসমাইল তৎক্ষণাৎ বাংলাে দিল। রুশ্বিগী তার বুকের উপত্যকা থেকে বার করে আনল একটা লেফাফা। তার গর্ভ থেকে বার করল একটা নোটবই আর পেন্সিল। নাম ধাম টুকে নিল সে। ইসমাইল ভয়ে ভয়ে বলল, এর কি কোনও প্রয়োজন ছিল, বড়দি?

—ছিল। এবার তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখি?

আকাশ থেকে পড়ল ইসমাইল : মানে? আমার লাইসেন্সের কী দরকার?

রুশ্বিগী বলে, শোন ইসমাইল। আপাতত তোমার সঙ্গে যাবে মালতী আর কৃষ্ণ। আমরা দুজন এখানেই থাকব। ধর যদি ঐ দুজনের—মানে মালতী আর কৃষ্ণার ভালোমন্দ কিছু হয়, তখন আমি পুলিশকে কী রিপোর্ট করব? পুলিশ কেমন করে খুঁজে বার করবে তোমাকে?

ইসমাইল পাক্কা দশ সেকেন্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর একটা ঢোক গিলে বলল, তাহলে থাক বড়দি, পুলিশ-টুলিশ মানে...

—থাক। রুশ্বিগী উঠে দাঁড়ায়।

ইসমাইল পুনরায় বলে, আচ্ছা বসুন। ‘ভালোমন্দ’ মানে?

রুশ্বিগী পুনরায় বসে পড়ে গাছতলায়। বলে, কত রকম হতে পারে। আগামী কালই কাগজে খবর বের হতে পারে দু-সুটি বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া গেছে পথের ধারে—যাদের বলাৎকার করে হত্যা করা হয়েছে। তখন?

ইসমাইলের গলকণ্ঠটা বার দুই গুঠা-নামা করল। ঢোক গিলে বললে, খোদা-কসম। সে রকম কোনও কদ মতলব আমার নেই। আমি শ্রেফ ওদের দুজনকে মাসির বাড়ি পৌঁছে হাত ধুয়ে ফেলব। মাথা পিছু শও রূপেয়া কমিশন পাব আমি, খোদা-কসম। এটুকুই আমার স্বার্থ।

—হতে পারে। তারপর তোমার বাড়িউলি ওদের আফগানিস্তান কিম্বা আরবদেশে মোটা-টাকায় পাচার করতে পারে? পারে না?

—না, না, মাসির তেমন কোন ব্যাওসা নেই। সে আছে অন্য লোকের।

—সেই অন্য লোকের হাতেও তুমি ওদের দুজনকে তুলে দিতে পার। পার না? মোট কথা তোমার লাইসেন্স নাম্বারটা না পেলে আমি রাজী নই।

অগত্যা ইসমাইলকে বার করে দিতে হয়েছিল তার ড্রাইভিং লাইসেন্স। রুশ্বিগী তার নোটবুকে যাবতীয় তথ্য টুকে নিল। ইসমাইলের পুরো নাম, বর্তমান ও দেশের ঠিকানা, বাপের নাম, লাইসেন্স নাম্বার, কোন্ অফিস থেকে কবে ইস্যু হয়েছে।

ইসমাইল এতক্ষণে ধ্রুপ্ত করে, বড়দি, আপনি আসবেন না? আর ঐ ছোড়দি?

—ছোড়দি হয়তো যাবে। তবে মাসখানেক পরে। আর আমি যাব না।

—কেন বড়দি? এই নরকে কেন পড়ে থাকবেন?

—এদের দুজনের ব্যবস্থা হয়ে যাক। আমি আরও বড় কিছু করতে চাই। সে সব কথা তোমাকে পরে বলব।

ইসমাইল তাতেই রাজী হয়েছিল।

দীর্ঘপত্রের শেষ দিকে রুজ্বী লিখেছিল : মাস্টারসাব। আপনি দেবতা। আপনার সহায়তার কথা আমরা জীবনে ভুলব না। কিন্তু আপনি আমাদের ভালো করতে পারবেন না। মানে, যে ধরনের ভালো আপনি করতে চান— আমাদের সমাজে ফিরিয়ে নেওয়া, আমাদের সিন্ধিতে সিন্ধুর চিহ্ন আঁকবার আয়োজন, আমাদের সংসারী করে তোলা অথবা স্বাক্ষরী। দুঃখ করবেন না মাস্টারসাব। আমাদের একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। আর কিছু না হোক— বোম্বাই-দিল্লি-মাদ্রাজ-কলকাতায় কি ঠাঁই হবে না? ঐ যেসব এলাকাকে বলে ‘রেড-লাইট এরিয়া’? নিশ্চয় হবে।

তবে এই হতভাগিনীদের ছোটখাটো উপকার আপনি কিছুটা করতে পারবেন। যেমন, একটা অনুরোধ করছি : কাবেরীর হাতে একটি নোটবই থাকল। তাতে বাড়িউলি-মাসির নাম-ধাম, ইসমাইলের পাশ্চ সব কিছু লেখা আছে। আর থাকল আমাদের তিনজনের ছাড়পত্র, মাদ্রাজ হাইকোর্টের ছাপমারা অরিজিনাল দলিল—যাতে আমাদের সই অথবা টিপছাপ আছে ; আর আছে আদালতের ঘোষণা যে, আমরা মুক্ত প্রাণী। কৃষ্ণা, মালতী অথবা কাবেরীর যদি ভালো মন্দ কিছু হয় তাহলে আমার এই চিঠি, নোটবই ইত্যাদি আপনি পুলিশে জমা দেবেন : অপরাধীর শাস্তি হবে তাতে। আর যদি শোনে, ঐ তিনজন সেই নরক থেকে মুক্ত হয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু তারা বন্দি, তাহলে আদালতের এই তিনটি ছাড়পত্র হবে আপনার সহায়—ওদের তিনজনকে ছিনিয়ে আনতে। আপনি বয়সের ভারে ক্লান্ত, আমি জানি, তাই যদি মনে করেন আপনার স্বন্ধে আমি একটি শুক্লভার চাপিয়ে দিচ্ছি— যা আপনি বইতে পারবেন না, তাহলে সমস্ত কাগজপত্র আপনি সূতনুকা অথবা দেবদ্বি-ভাইকে পাঠিয়ে দেবেন। সূতনুকাকে আমি চিনি। সে আমাদের ভুলতে পারে না। তিনি দেবদ্বি ভাইজীকেও। মরদের মত মরদ! সে এ ভার সানন্দে বইতে রাজী হবে। ...আমার ছাড়পত্রখানা? সেখানা পুড়িয়ে ফেললাম, মাস্টারসাব। আমি যে রাজ্যে যাচ্ছি সেটা মাদ্রাজ হাইকোর্টের এন্টিয়ারের বাইরে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি...ও, না! ভুল হল। ভগবানের নাম তো আর মুখে আনব না প্রতিজ্ঞা করেছি...



বোর্ড অব ট্রাস্টির সেই উগ্রপন্থী সদস্য
জগমোহনজী, যিনি বলেছিলেন, ওদের খাড় ধরে
বার করে দাও, তাঁর শুভেচ্ছাটাও সফল হল না।
আয়াঙ্গার সা'ব যে সাত জনের পুনর্বাসনের
আয়োজন করেছিলেন তার বাইরেও ছিল অনেক
অনেক প্রাক্তন দেবদাসী। তারা দিবি আছে—মানে
জগমোহনজীর ভাষায়। তারা খায় দায় আর পায়ের
উপর পা তুলে ডুগডুগি বাজায়। কোন কাজ

কামের মধ্যে নেই। আয়াঙ্গার সা'ব তাদের দিয়ে সহজ সাধারণ কাজগুলোও করাবেন
না—মন্দিরের ঝাড়পোছ, ভোগ রাগ, আরতি বা সমবেত সঙ্গীত। তিনি চান না ওদের
লোকচক্ষুর সামনে উপস্থিত করতে। মন্দিরের সেই কলঙ্কজনক ইতিহাসটা জনসাধারণ
যত শীঘ্র ভুলে যায় ততই নাকি মঙ্গল। ক্রেদান্ত লজ্জাকর ইতিবৃত্তটা মানুষের মন থেকে
মুছে দেওয়া চাই। এ বিষয়ে মন্দির কমিটির সবাই একমত—নরমপন্থী রঙ্গনাথনজী,
চরমপন্থী জগমোহনরামজী এবং ম্যানেজার আয়াঙ্গার সা'ব। আর বোর্ডের চেয়ারম্যান
জাস্টিস প্যাটেল তো সে পরিচ্ছেদটা ইতিহাস থেকেও মুছে দিতে চান। মুশকিল হয়েছে
ঐ মূর্তিমতী প্রাক্তন দেবদাসীগুলোকে নিয়ে। সত্যযুগের মতো শাপ দিয়ে যদি ওদের
ভস্ম করে ফেলা যেত—নিদেন এক ঝাঁক পায়রা—তাহলে সহজেই লেঠা চুকে যেত।
কিন্তু এই কলি যুগে তা তো হবার নয়। ওরা যে চোখের সামনে বর্তমান। এ মন্দিরের
সতের জনের মধ্যে জনাসাতেককে মাত্র পাচার করা গেছে, তার ভিতর আবার দুজন
বুমেয়াঙের মতো ফিরে এসেছে। শুনতি মতো এখনও বারো জন প্রাক্তন দেবদাসী
ঐ 'নিকেতন' বাড়িখানি আলো—জগমোহনের ভাষায় কালো করে আছে। অন্যান্য
মন্দির থেকে সাময়িকভাবে যারা এসেছিল তাদেরও কেউ কেউ এখনও আছে।

ওদের মন্দিরে আসার হুকুম নেই—তাহলে মন্দিরের কলঙ্কময় ইতিহাসটাকে আবার
মনে পড়ে যাবে সবার ; যাত্রীদের একাগ্রতা, ভগবৎ চিন্তা সব উবে যাবে ; সবাই
ডাবডাব করে তাকিয়ে থাকবে ঐ দুরন্তযৌবনা অঙ্গুরীগুলোর দিকে। আবার ওদের
মন্দির-চৌহদ্দির বাইরেও পাঠানো চলে না। একে তো ওরা পথঘাট চেনে না, সামাজিক
রীতিনীতি জানে না, তায় কটর সুন্দরী এবং যদি কেউ চিনে ফেলে, তবে বুঝে নেবে
এ কোনও খানদানী ঘরের রক্ষণশীলা মহিলা নয়, সর্বজনভোগ্য জনপদবধু। সুতরাং
মন্দির চৌহদ্দির বাইরেও ওদের যেতে দেওয়া হয় না। কোনও প্রকাশ্য হুকুমজারী অবশ্য

করা হয়নি। মেয়েগুলো নিজেরাই ভয়ে কেঁচো হয়ে আছে ; মন্দির-চৌহদ্দির বাইরে পা সেবার সাহসই নেই। যেন খাঁচার পাখি।

ফলে ওরা করেটা কী? আয়াঙ্গার সা'ব ব্যবস্থা করেছেন—দু' একজন বৃদ্ধ মাস্টারমশাই দেবদাসী-নিকেতনে এসে ওদের লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেন। অধিকাংশেরই অক্ষর পরিচয় নেই—সুতরাং মাস্টার জোগাড় করা কঠিন হল না। ম্যাট্রিক পাশ মাস্টার হলেই যথেষ্ট, শুধু দেখতে হবে বয়সটা যেন বিপদসীমার এপারে না হয়। জনা-তিনেক মাস্টারমশাই পালা করে ওদের পড়িয়ে যান। এ ব্যবস্থায় প্রচণ্ড আপত্তি ছিল জগমোহনজীর—এ নাকি ভাষ্যে ঘি ঢালা। কিন্তু বোর্ড শেষ পর্যন্ত আয়াঙ্গার সা'ব-এর প্রস্তাবটাই গ্রহণ করেছে। মেয়েগুলোকে স্বয়ম্ভর হতে হলে প্রথমেই সাক্ষর হতে হবে। কিছুটা নামতা, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, দু'চারলাইন পড়তে পারা দরকার।

কিন্তু লেখাপড়ার দিকে মেয়েগুলোর আসী মন নেই। ওরা তার বদলে চায় গানের মাস্টার, নৃত্য শিক্ষক। ওদের মতে, এভাবেই ওরা সাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে, উপার্জনক্ষম হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু মন্দির-কমিটি এ প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। ফলে, ওরা না শেখে গান-বাজনা, না লেখাপড়া। মাস্টারমশাই তিনজন ঘড়ি ধরে আসেন—যান, মাহিনা আদায় করেন। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করে।

মজা এই যে, মন্দির কর্তৃপক্ষ যতই ওদের আড়াল করতে চান, লোকে ততই কৌতূহলী হয়ে পড়ে। যাত্রীরা, বিশেষ করে উত্তরখণ্ডের যাত্রীরা—যারা কলকাতা, পাটনা, কান্ধী, লক্ণৌ অঞ্চল থেকে তীর্থদর্শনে আসে, তাদের দূরন্ত কৌতূহল। সংবাদপত্র মারফত তারা জেনেছে দেবদাসী প্রথার অবসানের কথা, আর মাদ্রাজে এসে শুনেছে ঐ ইয়েলাম্মা-মন্দিরে আছে এখনও দশ-বিশজন প্রাক্তন দেবদাসী। এই দু-তিন বছর আগেও যারা গান গাইত, নাচত, যাত্রীরা খরচ করতে রাজী থাকলে 'ইয়ে'-তে পর্যন্ত রাজী। এখনও তারা আছে, তবে পর্দানশিন! দূর থেকে দেখা যায় কি না? সে তোমার ভাগ্য!

মন্দিরের নৈমিত্তিক কোণে দেখতে পাবে একটা লাল পয়েন্টিং করা বাড়ি; সেটাই দেবদাসী-নিকেতন। যাত্রীরা ক্যামেরা-কাঁধে ঐ দেবদাসী-নিকেতনের আশে-পাশে ঘুরঘুর করে। টেলি-ফোটো লেন্স তখন সহজলভ্য ছিল না, তাই ওদের এগিয়ে যেতে হত ঐ বাড়িটার দিকে। যদি দেখতে পাওয়া যায় কোনও অঙ্গরীকে—ছাদে, বারান্দায় অথবা বাতায়ন পথে।

ক্রমাগত বন্দীজীবনে একটা বিদ্রোহের ভাব জাগেই। যারা প্রথমদিকে রুদ্ধকারার জীবন মেনে নিয়েছিল, তারাই ক্রমশ কান্দাল হয়ে ওঠে একমুঠো বাতাসের জন্য, একফোঁটা রোদের জন্য কিংবা এক চিলতে আকাশের ছোঁওয়া। ওরা সান্ধ্য-প্রসাধনাতে ছাদে ওঠে, জানলার ধারে এসে বসে। দু'একজন দুঃসাহসিনী এগিয়ে এসে যাত্রীদের কারও কারও সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টাও করে।

—এন্না সমাচারম্?

যুবক যাত্রী নিজেকে ধন্য মনে করে। একগাল হেসে বলে, ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ট্যামিল; হিন্দি জানতি ক্যা?

জলতরঙ্গের শব্দ ওঠে তব্বী-শ্যামার কণ্ঠনালীতে। বেলকুড়ি গাঁথা বেণী দুলিয়ে বলতে চায়, ইংরেজি বা হিন্দি জানে না।

যাত্রী হাত-পা নেড়ে ইঙ্গিতে ওকে পোজ দিয়ে দাঁড়াতে বলে, যাতে ফটো নিতে পারে; সরে আসতে বলে পড়ন্ত কনে-দেখা-আলোর ছোপটাতে।

হঠাৎ হয়তো নজরে পড়ে কোনও দারোয়ানের। হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসে সে। দেবদাসীকে তামিলভাষায় নির্দেশ দেয় ঘরের ভিতর যেতে। যাত্রীকে বলে, ইধার আইয়ে বাবুসা'ব। উধর যানা মানা হৈ।

যত বজ্র আঁটুনি ততই ফস্কা গেরো। তাছাড়া যৌবনের ধর্মই ঐ। পাহাড়ের মাথায় বরফগলা জলের মতো। নিচে নামার পথ সে ঠিক খুঁজে নেবেই। এদিকে বাঁধ দাও তো ওদিক দিয়ে। আয়ান্তার নানান প্রস্তাব পেশ করেন—কীভাবে ওদের মনের খোরাক যোগানো যায়। ওদের দিয়ে সাক্ষ্য-আরতির ব্যবস্থাটা পুনরায় প্রবর্তন করলে ক্ষতি কী? কিন্তু বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স তাতে রাজী নন। তাঁরা দারোয়ানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। কড়া নজরে রাখতে হবে ঐ হাড়-বজ্জাত মাগীগুলোকে, তবেই ওদের ল্যাক্সাকানি বন্ধ হবে।

কিন্তু দারোয়ানরাও কিছু স্বাশ্বস্ত্র মুনির বংশধর নয়। যাত্রীদের হিপ-পকেটের ভার লাঘব হয়ে ওদের ট্যাক ভারী হলে, কিংবা দিদিমণিদের কিছু মিঠে মিঠে বোল শুনলে কোন্ না দ্বারপালের মন গলে?

একদিন একটি মেয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল!

সত্যভামা!

বোর্ড অব ডাইরেক্টার্সের জরুরী সভা বসল। বিচার সভা। এ তো মহা সর্বনাশের কথা! এতদিন যা হয়েছে হয়েছে; কিন্তু এখন এসব অনাচার চলতে দেওয়া চলে না। সহস্রাক্ষের মত পাষণ্ড এখন এ মন্দিরের কর্ণধার নয়—স্বয়ং মাদ্রাজ সরকার এ মন্দিরের দায়িত্ব অধিগ্রহণ করেছেন। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং সরকার তিনপক্ষের সদস্য আছে মন্দির কমিটিতে; চেয়ারম্যান মাদ্রাজ বিচারালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত মহাধার্মিক সম্মানীয় বিচারপতি। এমতাবস্থায় যদি এ জাতীয় খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে যায় তখন যে মুখ দেখানো দায় হবে!

ওঁরা স্থির করলেন, অত্যন্ত কঠোর সাজা দেওয়া দরকার, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও মেয়ে ও পথে পা বাড়াতে সাহস না পায়।

জগমোহনজী বললেন, ঐ সত্যভামার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, উন্টো গাধায়

চাপিয়ে মন্দির চৌহদ্দি থেকে বার করে দেওয়া হোক।

একেবারে খানদানী সাবেকী শাস্তিবিধানের নিদান!

রঙ্গনাথন বললেন, না, না, মাথা মুড়ানো-টুড়ানো নয়! তাতে পাবলিসিটিটা বাড়বে।
রাতারাতি ওকে পাচার করতে হবে।

প্রফেসর আয়াক্সার বলেন, কিন্তু কোথায়?

—ওর বাবা-মার নাম ঠিকানা লেখা নেই খাতায়?

—থাকলেও কোন সুবিধা হবে না। এতদিন পর ওকে নিশ্চয়ই তারা গ্রহণ করবে না। তারা আগ্রহী হলেও সেখানকার গ্রাম্য সমাজ তাতে রাজী হবে না। এ তো মেয়েটিকে প্রস্টিচ্যুট হতে বাধ্য করা।

রঙ্গনাথনজী বলেন, তাই তো হতে চায় ও, প্রফেসর আয়াক্সার! সেটাই ওর আন্তরিক কামনা! অমন মেয়ের পাশে এটাই তো স্বাভাবিক।

প্রফেসর আয়াক্সার রুখে ওঠেন, তবে ওকে শাস্তি দিতে চাইছেন কেন? এটাই যদি স্বাভাবিক হয়, এটাই যদি যোগ্য হয়, তাহলে বিচার করে শাস্তি দিচ্ছেন কোন অধিকারে?

রঙ্গনাথন কোণঠাসা হয়ে বলেন, আপনি তাহলে কী করতে চান?

—আমি কেন চাইব? আমি মিটিং-এর কন্ভেনার। একটি অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি আমরা, তাই জরুরী মিটিং ডেকেছি। ব্যবস্থা যা নেবার তা বোর্ড নেবে। আমি শুধু সেটা কার্যকরী করব।

জাস্টিস প্যাটেল বলেন, এক হিসাবে প্রফেসর আয়াক্সার ঠিক কথাই বলছেন। মাথা মোড়ানো হবে কি না, তাড়ানো হবে কি না, আদৌ শাস্তি দেওয়া হবে কি না এসব প্রশ্ন এখনই উঠছে না....

জগমোহন বিস্মিতকণ্ঠে বলেন, অপরাধীকে আদৌ শাস্তি দেওয়া হবে কি না তাতেও আপনার সন্দেহ? কী বলছেন স্যার?

হাসলেন বিনায়ক প্যাটেল। বললেন, আজীবন জজিয়তি করেছে, জগমোহনজী। আমার মতে সত্যভামা অপরাধী নয়, এই মুহূর্তে সে অভিযুক্ত মাত্র। তার বিচার শেষ না হলে তাকে অপরাধী বলা যায় না। অপরাধটা প্রমাণ হোক আগে!

—বেশ হোক! আজই। এখনই।

—হ্যাঁ, সেরকম ব্যবস্থাই করেছে। আমার মতে সর্বপ্রথমে আমাদের জেনে নিতে হবে অপর দুটি মেয়ের নাম। দলে ওরা তিনজন ছিল। ভুলবেন না।

বিচার-সভাটা বসল মন্দিরের অফিস ঘরে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে। মাঝখানে জাস্টিস প্যাটেলের চেয়ার, এপাশে রঙ্গনাথন ও জগমোহন, ওপাশে আয়াক্সার।

হাজির হল অপরাধী একজন জোগতির হাত ধরে। মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টি। এল সেই দারোয়ানটি যে, হাতে-নাতে সত্যভামাকে পাকড়াও করেছে। জগমোহনজী স্বনিযুক্ত দেবদাসী ৬৪

প্রসিকিউশান কাউন্সেল-এর ভূমিকাটি পালনের দায়িত্ব নিলেন।

দারোয়ান তার এজাহারে বললে, শেষ রাতে, তখনও পূর্ব আকাশটা ফর্সা হয়নি ছজুর, আমার মনে হল একটা ট্যান্ডি এসে থামল মন্দিরের সামনে। আমি ছজুর, আমার ঘরের জানলা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম। মনে হল, ট্যান্ডিতে জনা-তিনেক পুরুষ আর তিনজন মেয়ে ঠাসাঠাসি করে বসে আছে। ট্যান্ডির নম্বর প্লেটটা পড়া গেল না, কারণ তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। মেয়ে তিনজন গুটি গুটি নেমে সিং-দরোজা পার হয়ে মন্দির চত্বরে ঢুকল। ট্যান্ডিটা স্টাটেই ছিল, এক পাক দিয়ে চলে গেল মাদ্রাজের দিকে। আমি বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে বার হলাম। চ্যালেঞ্জ করলাম : কে যায় ? তিনটে মেয়েই পড়ি তো মরি ছুট লাগালো দেবদাসী নিকৈতনের দিকে। আমি গুদের তাড়া করলাম। দুজন পালিয়ে গেল। ধরা পড়ল শুধু সত্যভামা।

জগমোহনজী আসামীকে প্রশ্ন করলেন, তুমি রাতে বাইরে ছিলে ?

—হ্যাঁ।

—তোমার সঙ্গে আর দুজন কে কে ছিল ?

—আমি একাই ছিলাম।

—বাজে কথা বল না। বল, আর দুজন কে কে ?

কিন্তু কিছুতেই ওকে দিয়ে স্বীকার করানো গেল না।

শুধু তাই নয়। সারা রাত সে কোথায় ছিল, কার ব্যবস্থাপনায় সে কেমন করে বাইরে গিয়েছিল এসব প্রশ্নের কোনও জবাবই সে দিল না।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড—ভোর রাতে মন্দিরের প্রকাণ্ড সিংদরজা কেমন করে খোলা থাকল এ প্রশ্ন কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করল না—না আসামীকে, না ‘উইটনেস্ ফর দ্য প্রসিকিউশান’কে।

দুর্ভাগ্যবশত এ বিচারসভায় ‘ডিফেন্স কাউন্সেল’ বলে কেউ ছিল না।

বাকি দুটি মেয়ের নাম উদ্ধার করার বিষয়ে জগমোহন নানাবিধ ‘সাজেসশান’ দাখিল করলেন ; বোধকরি সেগুলি মনু-সংহিতা মোতাবেক। কিন্তু বিচারক সে সব প্রস্তাবে কান দিলেন না। সকলের সব এজাহার শুনে, আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দিয়ে তিনি শেষ সিদ্ধান্তে এলেন। বললেন, দেখ সত্যভামা, এ জাতীয় অনাচার আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। তোমাদের ভদ্রভাবে বাঁচবার সুযোগ আমরা দিতে চাই, দিয়ে চলেছিলাম এতদিন। কিন্তু তুমি এবং তোমার অপর দুজন সঙ্গী যে ব্যবহার করেছ তা অত্যন্ত অন্যায়। তুমি একাই ধরা পড়েছ বলে শুধু তোমাকে শাস্তি দিয়ে বাকি দুজনকে যদি আমরা বেকুসুর ছেড়ে দিই সেটা অন্যায় হবে। তুমি বরং বাকিদুজনের নাম স্বীকার কর। প্রথম অপরাধ বলে সে-ক্ষেত্রে আমি তিনজনকেই লঘুদণ্ড দেব। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না কর, অপর দুজন অপরাধীর নাম না বলে দাও, তাহলে

বাধ্য হয়ে আমাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে।

সত্যভামা মাথা নিচু করে বুনো ঘোড়ার মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

—কী? ওদের দুজনের নাম স্বীকার করবে?

—আমি একাই গিয়েছিলাম মাদ্রাজে।

—তুমি আমাকে বাধ্য করছ, কঠিন শাস্তি দিতে।

সত্যভামা নিরুত্তর।

—তোমাকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হব আমি।

—বেশ! চলে যাব!

অগত্যা সেই রায়ই দিলেন জাস্টিস্ প্যাটেল। সত্যভামাকে সূর্যাস্তের আগে এই মন্দির-চত্বর ছেড়ে চলে যেতে হবে। সে যেখানে যেতে চায় সেখানেই পৌঁছে দেওয়া হবে। তাকে যেতে হবে একবস্ত্রে!

—কোথায় যাবে তুমি? কোথাকার রেলটিকিট কেটে দেব?

এতক্ষণে মুখ তুলে মেয়েটা কথা বলল। সকলকে এক নজর দেখে নিয়ে বললে, আপনাদের কিছুই করতে হবে না। আপনাদের আদেশ আমি মেনে নিলাম। সন্ধ্যার আগেই আমি মন্দিরের বাইরে গিয়ে বসে থাকব। আমাকে নিতে আসবে ওরা।

দাঁতে দাঁত দিয়ে রঙ্গনাথন বলেন, এভাবে ওকে যেতে দেওয়া চলে না, স্যার। মেয়েটা প্রস্টিচুট হয়ে যাবার হুমকি দিচ্ছে। আমরা জেনেশুনে যদি ওকে যেতে দিই তাহলে খবরের কাগজে...

—তাহলে কী করতে চান আপনারা?

জগমোহন বলেন, সহস্রাক্ষর আমলে একটা ‘ওজ্জিকক্ষ’ ছিল, মানে ‘সলিটারি প্রিজন্স’। আপাতত সেখানে ওকে পাঠানো হক। যতক্ষণ না ঐ হারামজাদী আর দুটি মেয়ের নাম বলে দিতে রাজী হয় ততক্ষণ ও ওখানেই পড়ে থাক। অনাহারে! নিরশু উপবাস!

দেখা গেল, এ প্রস্তাবে সকলেই একমত। যদিচ ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথাটাই প্রথমে মনে উদয় হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেটা কোনও সমাধান নয়। তাড়িয়ে দিতে চাইলে অসহায় মেয়েটা হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে, তবেই না বহিষ্কার দণ্ডটি জমজমাট হয়। যেই বললাম, ‘গেট আউট!’ অমনি ড্যাংডেঙ্টিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে চেপে বসল ট্যান্ডিতে, আর যাওয়ার আগে হাত বার করে ‘টা-টা’ করল, এ আবার কোন জাতের বহিষ্কারদণ্ড?

অগত্যা সেই হুকুমই বহাল থাকল। বিতাড়ন নয়, আপাতত সলিটারি প্রিজন্স। অনির্দিষ্টকাল অনাহার!

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার-সভার অবসান হল। জোগতিকে ডেকে বলা হল মেয়েটিকে দেবদাসী ৬৬

‘শুদ্ধিকক্ষে’ নিয়ে যেতে।

কিন্তু দ্বার খুলে দেওয়ামাত্র ঘটল আর একটা ঘটনা। খাজাখীবাবু এগিয়ে এসে বললে, কোর্টের পেয়াদা এসে বসে আছে অনেকক্ষণ। তাকে কি ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে?

—কোর্টের পেয়াদা। কী চায় সে? কাকে চায়?

—আজ্ঞে আপনাদের সবাইকেই।

লোকটা অনুমতির অপেক্ষা না করে খোলা দরজা দেখে ভিতরে চলে এল। জাস্টিস বিনায়ক প্যাটেলকে শনাক্ত করার প্রয়োজনই হল না। লোকটা তাঁরই অধীনে দশ-বিশ বছর চাকরি করেছে। তাঁর আদেশ-নামাই এতকাল সার্ভ করে এসেছে। লম্বা সেলাম করে খাতাখানা বাড়িয়ে ধরল।

মাদ্রাজ কোর্টের আদেশনামা আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ভ করা হল ইয়েলাম্মা মন্দিরের ‘বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স’দের প্রতিটি সদস্যকে পৃথকভাবে। সেখা গেল, শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অভিযোগ এনেছেন যে, ইয়েলাম্মা মন্দিরের বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স প্রাক্তন দেবদেবীদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন। ‘প্রিভেনশন অব ডেডিকেশন’ আইনে যাদের মুক্ত নাগরিক বলে স্বীকার করা হয়েছে, যাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে আদালতের মুক্তিপত্র ইস্যু করা হয়েছে, এমন প্রাপ্তবয়স্ক প্রাক্তন দেবদাসীদের নানাধকার বিধিবহির্ভূত শাস্তিবিধান করা হচ্ছে : যথা, ‘কনফাইনমেন্ট’ বা আটক করা, স্বৈচ্ছা-গমনাগমনের বাধাপ্রদান ইত্যাদি। সুতরাং মহামান্য আদালত এ বিষয়ে গুনানীর পূর্বে সাময়িকভাবে রুল জারী করছেন, যাতে ইয়েলাম্মা-মন্দিরের কোন প্রাক্তন দেবদাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতায় কোনভাবে হস্তক্ষেপ না করা হয়।

কাগজগুলি সই করে নিতে হল।

জাস্টিস প্যাটেল কেমন যেন অপমানিত বোধ করেন নিজেকে। কিন্তু উপায় নেই। যে আদেশটা এইমাত্র জারী করেছেন সেটা খারিজ করতে হবে। হঠাৎ নজরে পড়ল নোটিস-সার্ভারের পেছনে ঘাপটি মেরে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সে হচ্ছে গণেশন। ওঁরই আদালতে প্রাকটিস করত। উনি আদালত ছেড়ে এসেছেন, কিন্তু লোকটা আজও ওখানেই ওকালতি করছে। জাস্টিস গলা বাড়িয়ে বলেন, কে ও গণেশন না?

বাধ্য হয়ে লোকটা এগিয়ে এসে অভিবাদন করল।

—তুমি না সহস্রাক্ষের অ্যাটর্নি ছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার তো সবই জানা আছে হজুর।

জাস্টিস প্যাটেল ব্যঙ্গ করে বলে ওঠেন, না, সবটা আর জানি কই? তুমি যে এখনও দেবদাসী মহলে ঘুরঘুর করছ এ খবরটা তো এইমাত্র জানলাম।

জাতে উকিল। মুখে মুখে জবাব তার ওষ্ঠাগ্রে। লোকটা এবার আদালতের কায়দায়

একটা কেতাদুরস্ত 'বাও' করল। এক গাল হেসে বললে, এ বান্দা তো হজুর চিরটাকাল 'আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলেছে। 'মহাজন গতঃ যেন স পস্থা', মি লর্ড!

তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করলেন জাস্টিস প্যাটেল। লোকটা সহস্রাক্ষের আর্টার্নি ছিল। কতদূর কী জানে, কে জানে। খাতাপত্র নিশ্চয় ঘেঁটেছে—ফলে মন্দির তহবিলে তাঁর এককালীন দানটার কথা নিশ্চয় জানে। হয়তো একথাও জানে যে, তিনি এ মন্দিরে বছর বছর সমবেত হতেন উৎসর্গ-উৎসবে সক্রিয় অংশ নিতে। এবং একবার মাথা ফাটিয়ে পালিয়ে বাঁচেন।

গণেশন বিলম্ব দূর কানকাটা। এবার সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এসে সত্যভামাকে বলল, এন্কোয়ারির সময় সীতা আর সরমার নাম বলে দাওনি তো?

সত্যভামা সলজ্জে মাথা নেড়ে বলে, আঞ্জে না। তাই কি পারি? আপনি বারণ করে দিলেন যে?

—বাঁচালে! না হলে ওদের দুজনকেও এঁরা কঠিন শাস্তি দিতেন। সলিটারি ইম্প্রিজন্মেন্ট উইদাউট ফুড।

প্রফেসর আয়াক্সার বলেন, মিস্টার গণেশন! এবার আপনি বাইরে যান। আশা করি কোর্ট অফিসারের কাজ শেষ হয়েছে।

নোটিস-সার্ভার তৎক্ষণাৎ লম্বা সেলাম করে কক্ষ ত্যাগ করে।

গণেশনও এগিয়ে যায় তার পিছু পিছু। শুধু চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে সত্যভামাকে উদ্দেশ্য করে বলে, রাত আটটার সময় ট্যান্ডি নিয়ে আসব। তৈরী থেকো। আর ওদের দুজনকেও তৈরী থাকতে বল—ঐ সীতা আর সরমাকে।

সীতা, সরমা, সত্যভামা—কৃষ্ণা, কাবেরী, রুক্ষিণী, মালতী—চম্পা, মেনকা, লছমী ইত্যাদি প্রভৃতি। সকলের কথা সূতনুকা জানে না। তবে এটুকু জানে—অধিকাংশই এসে নাম লিখিয়েছে মাদ্রাজের লাল-বাতিজ্বলা চাকলাটায়। বেশ একটা ব্যবসাই গড়ে উঠল। সরকারের যেমন পরিকল্পনা ছিল প্রথমটায়। দেবদাসীরা একত্র হ'বে মীনাক্ষী মন্দিরে এবং ইয়েলান্মা মন্দিরে। সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে, খেপে খেপে ওদের পুনর্বাসনে পাঠানো হবে। 'অ্যাপ্টিচ্যুড' বুঝে। কেউ শিখবে নার্সিং, কেউ উইডিং, কেউ বা কুটীরশিল্প।

সরকারী প্রচেষ্টা বার্থ হবার পর বেসরকারী কর্মকর্তারা প্রায় অনুরূপ ভাবেই অগ্রসর হলেন। বিভিন্ন মন্দিরের প্রাক্তন দেবদাসী প্রাথমিকভাবে সমবেত হতে শুরু করল মাদ্রাজের পতিতালয়ে। সেখান থেকে ওদের প্রেরণ করা হতে থাকে বিভিন্ন অঞ্চলে—চাহিদা এবং 'অ্যাপ্টিচ্যুড' অনুসারে। দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই! লাল-বাতিজ্বলা চাকলা কোন্ শহরে নেই? সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল দেবতার প্রসাদ! যারা ছিল দেবদাসী। বিভিন্ন এলাকার বাড়িউলি-মাসিরা সাগ্রহে তাদের ঠাই দিল। বেবুশ্যে নয়, দেবদাসী বলে দেবদাসী ৬৮

কতা। এখন তাদের মালা গাঁথতে হয় না, চন্দন বাটতে হয় না ; নাচগান হয়তো করতে হয়, তবে রাধারমণ কৃষ্ণের প্রীতি-কামনায় আর নয়, কংসদের মনোহরণে। সাজের বেলা সেই একইভাবে চোখে সূর্য্যও টানতে হয়, মাথায় জড়িয়ে নিতে হয় জুইয়ের মালা, রাশে বিছানায় চিত হয়ে শুতেও হয়।

জোগতি হলে এতকাল যাহোক মাসোহারা পেত। সহস্রাঙ্ক এবং তার পূর্বপুরুষ যতবড় পাষণ্ডই হোক, দেবদাসীদের যৌবন গেলে, তাদের মুক্তি দিলে আশ্চর্য্যত করত না, একটা পেনশনের ব্যবস্থা করত। অ্যাসেমব্রিতে এবং লোকসভায় যাঁরা ভোটভূটি করে 'প্রিভেনশান অব ডেডিকেশন অ্যাক্ট' পাশ করে ওদের মন্দির থেকে তাড়ালেন—আচ্ছা বাপু, না হয় 'মুক্তিই দিলেন', তাঁরা কিন্তু ওদের পুনর্বাসনের জন্য বাজেটে কোন টাকার বরাদ্দ ধরেননি। এটা ইতিহাস। দায়টা বর্তালো বেসরকারী খাতে।

সত্যভামা, সরমা এবং সীতাকে সেই বিচারসভার পর আর কেউ দেখেনি ইয়েলাম্মা মন্দিরে। গণেশন সন্ধ্যাবেলা ট্যান্ড্রি নিয়ে এসেছিল। সর্বসমক্ষেই সদর্পে ওদের উঠিয়ে নিয়ে গেল। অধ্যাপক আয়াঙ্গারকে সাঙ্খ্যনা দিয়ে গেল, আপনি কিছু ভাবেবেন না স্যার, আমি মাসখানেকের ভিতরেই বাড়িটার ভেকেষ্ট পজেশন দিয়ে দেব আপনাকে। গুদাম সাবাড় 'সেল'!

তাই দিয়েছিল সত্যি। ঐ ঘটনার মাস ছয়েক পরে একবার ইয়েলাম্মা মন্দির দর্শনে এসেছিল দেবদ্বির—সূতনুকা। দেবদাসী-নিকেতন বাড়িটা তখন বিলকুল ফাঁকা। একটা অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য। জানলাগুলো বন্ধ। সদর-দরজার সামনে ঝুলছে তাল। খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, সরস্বতী-আম্মা দেহ রেখেছে। পুরানো দিনের দু-একজন জোগতি, দারোয়ান এখনও আছে। তারা চিনতে পারল। প্রফেসর আয়াঙ্গার অবশ্য সূতনুকাকে চেনেন না! কিন্তু তাঁর কাছেই সন্ধান পাওয়া গেল সহস্রাঙ্কের।

সেও এক আশ্চর্য উপাখ্যান।

মন্দিরের কর্তৃত্ব হারাবার পর দেখা গেল সহস্রাঙ্ক লোকটা সর্বস্বান্ত। স্বনামে-বেনামে সে কোনও সম্পত্তিই করেনি। অথচ মন্দির তহবিলে তখনও নগদ টাকাই ছিল হাজার পঞ্চাশ। সোনা-মণিমুক্তা যা ছিল তাও এক অবিখ্যাস্য অঙ্কের। যুগযুগান্তকাল ধরে অন্ধ বিশ্বাসে মানুষে দান করে গেছে মন্দির তহবিলে। সহস্রাঙ্ক যক্ষের ধন আগলে গেছে এতদিন। বেরিয়ে যেদিন এল সেদিন সে কপর্দকহীন।

তোমরা যাকে পাপ বল, অপরাধ বল, তা সে করেছে, মানছি—সব জাতেরই। কিন্তু শুধুমাত্র মন্দিরের স্বার্থে। ইয়েলাম্মা মায়ের স্বার্থে। তার বিশ্বাস ছিল—জীব দিয়েছেন যিনি, জীবন দেবেন তিনি। দুর্ভাগ্য বেচারির। জীবনের শেষ ঘাটে এসে সে উপলব্ধি করল—যে চিন্তামণিকে সে সারাজীবন ধরে তিনি জুগিয়ে গেছে সেই ইয়েলাম্মা মাতা তাকে ত্যাগ করে আয়াঙ্গার নিয়োজিত পুরোহিতের চিনির মশা গ্রহণ

করছেন নির্বিচারে। তা হোক, তবু সে নিত্য পূজা-অর্চনা করে যায় অভ্যাসবশে। মন্দির-চৌহদ্দির বাইরে এক কামরা একটা ঝুপড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে বৃদ্ধ। ইতিমধ্যে পক্ষাঘাতে নাকি লোকটা চলচ্ছক্তিহীন। তার বাম অঙ্গ পড়ে গেছে। কে একটা মেয়ে তাকে দুবেলা দুমুঠো রৌখে দেয়।

—কে একটা মেয়ে? কে সে?—জ্ঞানতে চাইল সুতনুকা।

—তা তো জানি না দিদি। তবে মেয়েটা ঐ দেবদাসী-নিকেতনেই থাকত।—জানালো নতুন দারোগ্যান।

—সেই ছাপরাটা চিনিয়ে দিতে পার?

—কেন পারব না? ঐ তো এখান থেকেই দেখা যায়।

বেশিদূর যেতে পারেনি। মন্দির চূড়াটা দেখতে না পেলে বোধকরি মরেও তৃপ্তি হবে না পাষণ্ডটার। শয্যালীন পক্ষাঘাতগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিন্তু সুতনুকাকে চিনতে পেরেছিল ঠিক। দেবদিক্কেও।

প্রথামাসিক দেবদির প্রসন্ন করেছিল : এলা সমাচারম?

এটুকু তামিল সে এতদিনে শিখেছে : কী খবর?

পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষটা চারপাইতে শুয়ে শুয়েই ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, এলা নান্না ইড়িকাদি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। সমাচার তো ভালই।

ঈশ্বরবিশ্বাসী পাষণ্ডটা সব কিছুই খুইয়েছে—তার ঈশ্বরবিশ্বাস ছাড়া।

কিন্তু সহস্রাঙ্ক নয়, তার পিছনে যে মেয়েটি বসে ছিল তাকে দেখেই চমকে উঠেছিল সুতনুকা : পুন্না, তুই?

এখন সে ত্রয়োদশী। অঙ্ককার থেকে সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল শুকে : বড়দি।

সুতনুকার মনে পড়ে গেল অনেক অনেক কথা। এই পুন্নার অভিষেক হয়েছিল তারই সঙ্গে একসঙ্গে। দু বছর আগে। গণেশন-এর ঘর থেকে বার হয়ে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল সিট্ নিতে।

আশ্চর্য। সবাই যখন কিল্লয় হল মন্দির থেকে—নানান সোতে পড়ে—শাড়ি-গহনা, সর্বাঙ্গ সোনার মুড়ে দেবার গল্প, তখন ঐ এককোঁটা মেয়েটা রুখে দাঁড়িয়েছিল। না, সে যাবে না দেবদাসী-নিকেতন ছেড়ে। শেষমেশ তাকেও যেতে হল। তবে মন্দির ছেড়ে বেশি দূরে সে গেল না। সে এসে উঠল এই সহস্রাঙ্কের ছাপরায়। কেউ কোন প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ঠাই নাড়া করতে পারেনি।

সুতনুকা জনান্তিকে জ্ঞানতে চেয়েছিল, তাদের চলে কি করে?

—মাস্টার সা'ব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মন্দিরের গুরুগুলোর দেখভাল করি। জাবনা মেখে দিই, গোবর তুলে ঝুটে দিই, দুধ দুই। গোয়াল সাফা রাখি। আর পাকশালা থেকে দেবদাসী ৭০

দুজনের মতো প্রসাদ নিয়ে আসি।

—মাস্টার সা'ব কে?

—ঐ যে, আয়াস্কার সা'ব। আগে একটা মন্দির কমিটি ছিল। এখন নেই। এখন উনিই সর্বসর্বা। আডমিনিষ্ট্রেটর না কী যেন বলে ওরা। লোক খুব ভাল।

দেবদ্বি বললে, কিন্তু সহস্রাব্দের দেহান্ত হলে তুমি তো আবার ভেসে যাবে?

—যাব না, বড়দা। মাস্টার সাব আমাকে বলে রেখেছে : পুষ্পা। এ মন্দিরের দরজা তোর জন্যে সব সময় খোলা থাকবে। যখনই তুই চাইবি, এসে আশ্রয় নিবি। আমি বৈচে থাকি আর না থাকি। আমি সেইমতো খাতাপত্রে নির্দেশ রেখে যাচ্ছি।

শালপাতায় করে সামান্য প্রসাদ নিয়ে এসে দিল ওদের দুজনকে। বললে, আমার ঘরে আর তো কিছু নেই।

দেবদ্বি বললে, না না। এসব কেন? তোমাদের খাবারটুকুই ধরে দিয়েছ নিশ্চয়।

সহস্রাব্দ ক্ষীণকণ্ঠে বলে, তা দিলেও তোমরা আপত্তি কোরো না। তোমরা অতিথি। তাছাড়া মন্দিরের প্রসাদ।

অগত্যা সামান্য কিছু মুখে দিতে হল।

দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল সুতনুকার : কেন এই সিদ্ধান্ত? মুক্তি পেয়েও কেন ঐ এককোঁটা মেয়েটা পড়ে আছে এই নখদস্তহীন পাশপট্টার কাছে? সুতনুকা ওর হাত ধরে আড়ালে উঠে এল। জানতে চাইল কারণটা।

মেয়েটা আর পাঁচজনকে কী বলেছে সুতনুকা জানে না, নিজের মনকে সে কী বুঝিয়েছে তাও জানা নেই। কিন্তু সুতনুকার কানে কানে সে বলেছিল, আসল কারণটা তোমাকে চুপি চুপি বলছি বড়দি—ঐ জিনিসটাকে আমি বড় ডরাই। কেমন যেন আতঙ্ক ধরে গেছে। সেই প্রথম দিন থেকেই। যেখানেই যাই, যার কাছেই আশ্রয় চাই, কেউ তো ছেড়ে কথা বলবে না। পণ্ডিতজীর পঁচাত্তর চলছে, সে অধর্ব, তার এক অঙ্গ পড়ে গেছে। এই আমার মনের মতো নাগর, বড়দি। বুঝলে না? বয়সও তো বড় কম হল না? আর কত সময়? বল?

তা বটে। জীবনের সুদীর্ঘ তেরটি বছর পাড়ি দিয়ে ত্রয়োদশী পুষ্পা তার দুনিয়াদারীর পালা সাঙ্গ করেছে।

—‘হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে!’

সোজা কথা! সাতকম—এক কুড়ি বয়স হল যে!

আর কত সময়? বল?



দেবদিল্ল এখন দিল্লির বাসিন্দা। বোম্বাইয়ের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে, রাজধানীতে আর একটি সংবাদপত্রে আরও ভাল চাকরির অফার পেয়ে। মাঝে মাঝে তাকে ট্যারে যেতে হয়, দেশ-বিদেশে ঘুরতে হয়! মাদ্রাজেও এসেছে কয়েকবার। সূতনুকার সঙ্গে দেখা করে গেছে। উপহার এনে দিয়েছে—তার, খোকনের। দেখা হয়েছে এ চার্চের সাক্ষাৎ-কক্ষে। সূতনুকা বিবাহে রাজী না হওয়া পর্যন্ত সে ঘনিষ্ঠ-সাক্ষাতে সম্মত নয়। দেবদিল্ল

এখনও বুঝে উঠতে পারে না—কেন সূতনুকা আজও মনস্থির করে উঠতে পারছে না। বরং বলা উচিত, ইতিমধ্যে এমন কী ঘটেছে যাতে সূতনুকার নতুন করে মনস্থির করার প্রয়াস উঠছে। ‘সুদেব’ নামটা পর্যন্ত সে স্বীকার করে নিয়েছিল। বোধকরি সূতনুকা ভাবছে, খোকনের পিতৃত্বের দায় তার স্বন্ধে চাপানোটা ঠিক হবে না। কেন? সুদেব জারজ বলে? কিন্তু দেবদিল্ল নিজেই তো...

...না! সে নিজে নয়। এতদিনে সেটা সে জানে।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সু-কে এখনও সব জানানো হয়নি।

একদিন সে সংবাদপত্রের অফিসে বসে কাজ করছে, দিল্লিতে—হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। ও আত্মপরিচয় ঘোষণা করতেই অপারেটর বললে, একটু ধরুন স্যার, একটা বাইরের ‘কল’ আছে। হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে।

দেবদিল্ল তখনই সতর্ক হয়ে ওঠে। নির্ধাত কোন বন্ধুর মোটর অ্যান্ড্রিডেন্ট হয়েছে। কার? একটু পরেই টেলিফোনে যোগাযোগ ঘটল। পুনরায় আত্মপরিচয় দিতে ও-প্রান্তবাসী জানানেন : এন্সুগি এমার্জেন্সি-ওয়ার্ডে একটি কেস এসেছে। নিকটতম আত্মীয় হিসাবে আপনার নাম জানানো হয়েছে...

নিকটতম আত্মীয়। তিনকুলে ওর কে আছে? মামারা কেউ? ও বলে, মোটর অ্যান্ড্রিডেন্ট?

—না। কেস অব পয়জনিং। মনে হচ্ছে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ব্রিপিং ট্যাবলেট খেয়েছেন। অ্যাটেমট টু সুইসাইড।

আরো সতর্ক হয়ে উঠল দেবদিল্ল। থানা-পুলিশ-এজাহার। কিন্তু লোকটা কে? কী আশ্চর্য। সেই কথাই তো সবার আগে বলবে লোকটা, না কি? এবার তাই বললে, কী নাম?

—ধরুন, জিজ্ঞাসা করে বলছি।

টেলিফোনের 'কথা-মুখে' হাত চাপা দিয়ে ও-প্রান্তবাসী কাকে যেন হিন্দিতে বললেন, ক্যা নাম?

দেবদ্বির ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছে। কী ইন্‌এফিশিয়েন্ট লোকটা! রুগীর নামটা তো আগে জ্ঞানবি, তারপর টেলিফোন করবি?

—হ্যালো, মিস্টার দেবদ্বি?

—হ্যাঁ, শুনছি। বলুন?

—নাম, মতিচাঁদ দোবে।

টেলিফোনের ও-প্রান্তবাসীকে টেনে চড় মারা যায় না। দেবদ্বি গম্ভীর হয়ে বললে, সম্ভবত রং নাথার এবং রং পার্সন। মতিচাঁদ দোবে নামে আমি কাউকে চিনি না। তিনি যদি বলে থাকেন আমি তাঁর নিকটতম আত্মীয়, তাহলে সম্ভবত তিনি বন্ধ উদ্ভাদ।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল দেবদ্বি।

একটু পরেই আবার ফোনটা বেজে ওঠে।

—হ্যালো?

—লাইনটা কেটে গেছিল স্যার, সেই হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ড... নিন কথা বলুন...

দেবদ্বি বলতে গেল, লাইন কাটেনি আদৌ। সে নিজেই কেটে দিয়েছিল, কিন্তু সে কথা বলা হল না। সংবাদপত্রের অপারেটর ততক্ষণে হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছে।

—মিস্টার দেবদ্বি?

—ইয়েস! আবার কি হল? বললাম তো, মতিচাঁদ দোবেকে আমি চিনি না।

—না না, মতিচাঁদ দোবে পেশেন্ট নয়। কথাটা সব শুনবেন তো? তিনিই পেশেন্টকে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে এসেছেন। নিন কথা বলুন...

বোঝা গেল, টেলিফোন রিসিভারটা হাত ও মুখ বদলাল। এবার কান্নায়-ভেঙে-পড়া একটি বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। লোকটা দেহাতি হিন্দিতে বলল, বাবুজি! আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আপনি আমার মনিবের...ক্যা কই, আপ তো ইয় দেবদ্বিজী?

এবারও লাইনটা কেটে দিত, দিল না বৃদ্ধের কান্নায় ভেঙে পড়া কণ্ঠস্বরে। বললে, কহিয়ে? ক্যা সমাচার দোবেজী?

—মায় নোকর হঁ, সা'ব্। মুঝকো 'দোবেজী' মং কহিয়ে সা'ব্।

—তো ঠিক হয়। কহো, ক্যা ছয়া?

লোকটা বললে, তার মনিব কাল রাতে দেবদ্বির নামে একখানা চিঠি লিখেছেন।

চিঠিখানা ওর জেব-এ আছে। সে কাউকে এখনও দেখায়নি। চিঠি লিখে ওর সাহেব এক মুঠো ঘূমের ওয়ুধ খেয়ে আত্মনাশ করতে চেয়েছেন। ও একখানা ট্যান্ড্রি করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। বাঁচবার আশা খুবই কম, ডাগ্দারবাবুরা বলাবলি করছিলেন। ওকে সকলে পুছ করলেন কি সাহেবের জ্ঞান-পহ্চান, মেহমান কে আছে? জ্ঞান-পহ্চান তো লাখো আদমির নাম সে বাতাতে পারে; কিন্তু মেহমান? ও নিজ বুদ্ধি বিবেচনা মতো দেবদিসের নাম বাতিয়ে দিয়েছে। দেবদিস যেন ওর গোস্তাকি মাফ করে। সে দেবদিস হজুরের নাম জানত, আর জানতো কোন অখবরে তিনি নোকরি করেন।

বিস্মিত দেবদিসকে অতঃপর প্রশ্ন করতে হল : কী নাম তোমার মনিবের?

—জী হজুর, ওঁর নাম তো রিটার্ডার্ড জাস্টিস্ বিনায়ক প্যাটেল!

বজ্রাহত হয়ে গেল দেবদিস। তার চব্বিশ বছরের জীবনে যাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না, শুধু নামটাই শোনা ছিল মামাদের কাছে, সেই অপরিচিত অসেখা মানুষটা।

রীতিমতো দীর্ঘ সময় নিল সে পরবর্তী প্রশ্নটা পেশ করতে। দোবেজী তাড়া দিল না, জ্ঞানতে চাইল না সে লাইনে আছে কিনা। লোকটা বুদ্ধিমান, যন্ত্রটা কানে ধরে সে প্রতীক্ষা করছিল।

—তুমি কেমন করে জ্ঞানলে আমি তাঁর নিকটতম আত্মীয়?

—হজুরকে আমি কখনও দেখিনি; কিন্তু মাইজিকে দেখেছি। আমি সাতাইশ বরিশ ধরে সাহেবের নোকরি করছি হজুর।

—তিনি কি আমাকে খবর দিতে বলেছিলেন?

—জী নহি। আমি আমার বুদ্ধি বিবেচনা মতো কাজ করছি হজুর। আমি বড় অসহায় বোধ করছি ছোট্ট-সাব! এসব ক্ষেত্রে কী করণীয় আমি কিছুই জানি না।

দেবদিস মনস্থির করতে এবার সময় নিল না। বলল, ঠিক আছে দোবেজী। তুমি অপেক্ষা কর। আমি এখনই আসছি।

টেলিফোনটা রেখে ও কোঁটা গায়ে দিচ্ছিল, তখনই তৃতীয়বার বেজে উঠল সেটা। অপারেটর সৌজন্য দেখিয়ে জ্ঞানতে চাইল কোনও দুঃসংবাদ আছে কি না—হাসপাতালের এমাজেলি ওয়ার্ড থেকে যখন ফোন! দেবদিস বললে, হ্যাঁ আমার একজন নিকট আত্মীয় অসুস্থ। আমি হাসপাতালে চলে যাচ্ছি। গুরুবজ্রানি-সা'বকে লাইনটা দিন—

অফিসে খবর দিয়ে তৎক্ষণাৎ স্কুটারে রওনা দিল হাসপাতালের দিকে।

পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ হল হাসপাতালের কেবিনে।

প্রথম সাক্ষাৎ। বৃদ্ধের তখন বাকরোধ হয়ে গেছে। নার্স বলল, এক মুঠো ত্রিপিং-পিল খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন উনি। বৃদ্ধের জ্ঞান ছিল, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। একদৃষ্টে তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন ছাব্বিশ বছরের জোয়ান দেবদাসী ৭৪

ছেলেটাকে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, জলে ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি—তুব দেখতে চাইছেন।

তারপর চোখ বুজলেন তিনি।

নার্স বললে, আয়্যাম সরি। এবার আপনি যেতে পারেন। আর জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হয় না।

দেবদিল্লি মাথা নিচু করে বার হয়ে এল কেবিন থেকে।

করিডরে দাঁড়িয়ে ছিল দোবেজী। ওর পিতৃদেবের পাচক ও পুরাতন ভৃত্য। বসন্ত ওর জন্মের আগে থেকেই সে এই চাকরিতে বহাল আছে। কেঁদে কেঁদে লোকটার চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। বললে, তার সাহেব মাসখানেক আগে এসে উঠেছেন দিল্লিতে। এখানে তাঁর একটি একতলা বাড়ি আছে—গ্রেটার কৈলাসের দিকে। সেখানে ছিল ওরা দুজন—প্রভু-ভৃত্য। গতকাল কী যেন একটা হয়েছিল—সাহেব সারাদিন ঘরের বাইরে আসেননি। কিছু মুখেও সেননি। সমস্ত দিন ওঁর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। দোবেজীর মনে হল, সাহেব অনেক পুরানো কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছেন সারা দিনে—কারণ দরজা বন্ধ থাকলেও একটা কাগজ-পোড়া গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। সন্ধ্যাবেলা উনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন; দোবেজীকে ডেকে তার হাতে মুখবন্ধ একখানা খাম দিয়ে বলেন পরদিন ঐ চিঠিখানা নিয়ে সংবাদপত্রের অফিসে যেতে। টেম্পো করে যাতায়াতের খরচও দিয়ে দিলেন। তারপর কোথাও কিছু নেই ওর হাতে খান-পাঁচেক এক শ টাকার নোট দিয়ে বললেন, টাকাটা তোর কাছে রাখ।

পাগড়ির কাপড়ে মুখটা ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে, তখন কি জানি, রাগেই উনি...

দেবদিল্লি চিঠিখানা পকেটে ফেলে বললে, এখানে সারা রাত্রি বসে থেকে লাভ নেই দোবেজী। তোমাকে ভিতরে যেতে দেবে না। বাড়ি যাও। কাল সকালে এস। আমি আমার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে এসেছি। তোমাদের বাড়িতে কি ফোন আছে?

—জী হাঁ।—টেলিফোন নাম্বারটা লিখে দিল।

একটু ইতস্তত করে দেবদিল্লি বলল, তোমার সাহেবের আর কেউ নেই?

দোবে অবাক হয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে, আবার কে থাকবে?

দ্বিধাধন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এবার জ্ঞানতে চাইল, আমার মায়ের মৃত্যু হবার পর তোমার সাহেব আর বিয়ে করেননি?

দৃষ্টি নত করল দোবেজী। মাথা নেড়ে জানাল : না!

আর কী জিজ্ঞাসা করা যায়? কী দরকার?

—তোমাকে গ্রেটার কৈলাশে পৌছে দেব? স্কুটারে উঠতে পারবে?

—ক্যা জরুরং? সা'ব তো বহুৎ সে রুপেয়া মুঝকো দে চুকা।

—তবে বাড়ি যাও। আমিও অফিস যাই।

অফিস কিন্তু গেল না সে। মনটা ভেঙে গেছে তার। পকেটে একখানা মুখবন্ধ চিঠি ওকে ক্রমাগত খোঁচা দিচ্ছিল।

দিল্লিতে এসে এখনও কোনও মাথা গোঁজার আশ্রয় যোগাড় করে উঠতে পারেনি। আছে একটা হোটেল। সংবাদপত্রের খরচে। ফিরে এল সেখানেই। জামাকাপড় ছাড়া, মুখ-হাত ধোওয়া কিছুই যেন সময় নেই। জুতো, কোট-টাই খুলে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ল খাটে। বেড-সুইচটা ছেলে খুলে ফেলল মুখবন্ধ খামটা।

পিতার পত্র, পুত্রকে। জীবনে প্রথম এবং শেষ।

তাকে সম্বোধন করেছেন ‘মাই ডিয়ার মিস্টার দেব’ নামে। শেষ দিকে নজর গেল দেবের—না, আশীর্বাদ জানাননি, জানিয়েছেন শুভেচ্ছা। শেষ ছত্রে ‘মোর্স সিন্‌সিয়ারলি!’

না, ইংরেজি ভাষায় পত্র-রচনার যা রীতি তাতে এখানে বলা চলে না : পিতার পত্র, পুত্রকে।

বৃদ্ধ লিখেছেন, ‘আপনাকে এ পত্র লেখার...’

লিখেছেন ইংরেজিতে। অনুবাদে আপনিই ‘আপনি’ এসে যাচ্ছে। ভাষা ভাবের অনুগ বলে :

‘আপনাকে এ পত্র লেখার অধিকার আমার আছে কিনা আমার জানা নেই। সামাজিক মূল্যায়নে নেই ; নৈতিক বিচারে—নেই ; নিছক ভদ্রতার হিসাবেও—নেই। তবু আমার আশা—পত্রটি না পড়েই আপনি ছিঁড়ে ফেলবেন না। কারণ এ পত্রটি যখন আপনার হাতে পৌঁছাবে তখন সকালের কাগজটা আপনার দেখা হয়ে গেছে। পত্রলেখক যে মৃত এ সংবাদটা তখন আপনার জানা। আমার এই বাষট্টি বছরের জীবন—আজ রাত্রে যার যবনিকাপাত ঘটতে চলেছে—বড়ই নিঃসঙ্গ, বড়ই করুণ। মাপ করবেন মিস্টার দেব, আপনার সহানুভূতি চাইছি না। এ আমার স্বখাত-সন্মিল। দায়ী একান্তই আমি নিজে। বিবাহ করেছিলাম। একবারই। মিথ্যা সন্দেহে স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলাম—পুত্রকে গ্রহণ করিনি। সন্দেহটা যে মিথ্যা, সেটা জানতে পেরেছি অতি সম্প্রতি, মাত্র এই সপ্তাহে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি কেস-হিস্তি ঘটনাচক্রে নজরে পড়ায়। দীর্ঘ দুই দশক আগেকার কেস। নিতান্ত ঘটনাচক্রে আমার নজরে এতদিন পড়েনি এবং দৈবক্রমে হঠাৎ এতদিনে আমার হাতে এল। একটি বিবাহ-বিচ্ছেদের নগণ্য মামলা। পাত্রপাত্রী স্ত্রীস্টান। স্ত্রী মামলা জিতেছিল। সেই বাদিনী। বিচ্ছেদ চেয়েছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদিত হয়েছিল—কারণ ডাক্তারের এজাহারে বাদিনীর আবেদন সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছিল : তার সুদর্শন স্বামী বোন-সঙ্গমে অশক্ত ... মিস্টার দেব, স্বীকার করতে লজ্জায় আজ আমার মাথা কাটা যাচ্ছে...এই সুদর্শন যুবকটি ছিল আমার বন্ধু। আমার শ্রান্ত ধারণা হয়েছিল—এ ছেলেটি ছিল আমার স্ত্রীর গর্ভের সেই না-দেখা সন্তানের জনক !...মৃত্যু স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইবার সুযোগ আমার নেই—হয়তো

দেবদাসী ৭৬

রাত্রি শেষে সে সুযোগ পাব। তার সন্তানের কাছেও মার্জনা ভিক্ষার অধিকার আমার নেই।

‘প্রশ্ন হবে : তাহলে কেন এই চিঠি লিখছি? লিখছি, একটা অনুরোধ জানানতে।

‘এ দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। তাই উইল করে আমার যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে গেলাম আমার একমাত্র পুত্রকে। উইলের এক কপি আছে আমার ব্যাঙ্ক লকারে, এক কপি আজ ইনসিওর্ড পার্সেলে পাঠালাম আমার অ্যাটর্নিকে।

‘যদি আমার পুত্র আমাকে ক্ষমা না করেন, এই দান গ্রহণ না করেন, তাহলে সমস্ত সম্পত্তিটাই দেবোত্তর হয়ে যাবে—উইলে সে কথাও বলা হয়েছে।

‘আমার শুভেচ্ছা রইল।

‘ইতি—মোর্স সিন্সিয়ালি...’

বৃদ্ধ জানতেন না : তাঁর প্রায়শ্চিত্ত বাকি ছিল।

যমে-মানুষে টানাটানির পর মানুষই জিতল। হাসপাতাল থেকে আবার ফিরে এলেন তিনি সংসারের আবর্তে।

শুধু জীবন নয়, পেলেন সন্তানকে। তার ক্ষমাসুন্দর সান্নিধ্য।

দেবদিল এখন তার বাবার সংসারে থাকে। তিন-কামরার বাড়ি। হয়তো সম্প্রসারণ করতে হবে অচিরে। কারণ এখন সংসারে মাত্র তিনটি প্রাণী : পিতা, পুত্র ও পুরাতন ভৃত্য; কিন্তু শোনা গেল—দেবদিল একটি মেয়েকে ভালবাসে। পছন্দ করেই রেখেছে। নাম-পরিচয় এখনও জানায়নি। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। বিনায়ক কোনরকম হস্তক্ষেপ করবেন না। পুত্রের পছন্দ মতো পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে তুলবেন। যে পুত্রের জীবনে প্রথম ছাব্বিশটা বছরে পিতার কোন ভূমিকাই ছিল না সেখানে আজ হঠাৎ তাঁর মতামতের প্রশ্নই ওঠে না।

পুত্রবধূর সম্ভাবনায় খুশিয়াল হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ। এবং তাঁর পুরাতন ভৃত্য।



দ্বারপ্রান্তে মাদার এসে দাঁড়িয়েছেন।

সুতনুকা চিত্তাঙ্গগৎ থেকে ফিরে আসে বাস্তবে।
চার্চ-সংলগ্ন তার শয়নকক্ষে। দেখে, মাদার এসেছেন।
সুতনুকা আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। অভিবাদন
করে।

—বি সীটেড মাই চাইন্ড।—নিজেও আসন গ্রহণ
করেন তিনি। প্রশ্ন করেন, লিখেছ চিঠিটা?

—না। মনস্থির করে উঠতে পারছি না।

—মনস্থির করার আর তো কিছু নেই সু। তুমি যা চেয়েছিলে সেব তো তাতেই
রাজী হয়েছে। তুমি ইতস্তত করছ কেন? তোমার মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম বলে?
ভেবে দেখ, সে যুক্তিটা অর্থহীন। তুমি আজ প্রাপ্তবয়স্ক। তুমি স্বৈচ্ছায় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ
করলে তোমার মাকে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি—

বাধা দিয়ে সুতনুকা বলে ওঠে, না, না সেটা কিছু নয়।

—তবে কী চিন্তা করছ? সন্তানের কথা?

সুতনুকা মুখটা তুলল। বলল, সেটাও একটা প্রকাণ্ড বাধা। কিন্তু তাও নয় মাদার!
আমি ভাবছি—এত এত মেয়ের যে দুর্দশা হল, আমি তার ভাগিদার হব না কেন?
শুধুমাত্র ভাগ্য আমার প্রতি প্রশ্ন বলবে? আমার বান্ধবীদের সঙ্গে চিরকাল দুঃখ-দুর্দশা
ভাগ করে নিয়েছি। অপমান-অসম্মান-নির্যাতন সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছি। আজ
ওরা...

কান্নায় হঠাৎ ভেঙে পড়ল। আজকাল এই এক মুশকিল হয়েছে। কথায় কথায়
কান্নায় ওর গলা বুঁজে যায়। মাদার ওর মাথাটা কোলে টেনে নিয়ে চুলের মধ্যে বিলি
কাটতে থাকেন। এ অভিমানের কীই বা জবাব?

একটু পরে মাদার চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন চিঠিখানা শেষ করে
ফেলতে। আর যাবার সময় ওকে কিছু না বলে ঘুমন্ত খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে
গেলেন।

যেন সেটাই ছিল সুতনুকার পত্রচনার একমাত্র অন্তরায়। খোকন। ওর অবৈধ
সন্তান। তার কথা থেকেই মনে পড়ল তার বাপের কথা। আর সেই প্রসঙ্গে গতকাল
সন্ধ্যার মর্মান্তিক ঘটনাটা। এই ঘরের ভিতরেই। ঘরে তখন চারটি প্রাণী, আর ঘরের
বাইরে চৌকাঠে একজন। খোকন শুয়েছিল ঐ খাটে, মাদার সামনের চেয়ারটায়, ও
সেবদাসী ৭৮

নিজে বসেছিল ঐ টুলটায়, আর যে চেয়ারখানাতে ও এখন বসে আছে তাতে তখন বসেছিলেন খোকনের বাবা : জাস্টিস্ বিনায়ক প্যাটেল।

একান্ত-সাক্ষাত চেয়েছিলেন তিনি। মাদার সম্মত হননি। বলেছিলেন, সূতনুকা আপনাকে ইন্টারভ্যু দিতে স্বীকৃত হয়েছে ; কিন্তু আপনার যা বলার আছে তা আমার সামনে বলতে হবে।

—আমি কিন্তু তার একান্ত-সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম।

—জানি। এ কথা আপনি আগেও জানিয়েছেন। তাতে আমি সম্মত নই।

—কিন্তু আপনি কি সব কথা জানান?

—জানি।

—সূতনুকার সন্তানের পিতৃপরিচয়?

ওঁর চোখে চোখ রেখে দৃঢ় কণ্ঠে মাদার বলেছিলেন : ইয়েস।

জাস্টিস্ প্যাটেল শ্রাগ করে বলেছিলেন, বেশ। তবে তাই হোক।

সূতনুকাকে সম্বোধন করে অতঃপর বলেছিলেন, তুমি হয়তো তোমার জীবনের দুর্ভোগের জন্য আমাকেই দায়ী কর, তাই না?

সূতনুকা স্থির দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করেছিল, সেটা কি অযৌক্তিক?

—কিন্তু বিশ্বাস কর সূতনুকা, আদালতে আমি যে রায় দিয়েছিলাম তা ন্যায়ধর্মসম্মত। দেশের যা আইন...

—আই নো! 'ন্যায়ধর্মসম্মত' না হলেও আইন-সম্মত। না হলে আমরা আপীল করতাম। কিন্তু সেখানেই তো আপনার অপকীর্তি শেষ হয়নি, মিস্টার প্যাটেল। আপনি ইয়েলাম্মা মন্দিরে...

—হ্যাঁ! সেটাও! আমি ঐ মন্দিরের একজন পেট্রন ছিলাম। বছরে বছরে সেখানে যেতাম। বছরে একদিন। কিন্তু বিশ্বাস কর সূতনুকা—সেটাও ধর্মের নির্দেশে। আমি বিশ্বাস করতাম...

—আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না—

—কী?

—আপনি ধর্মের প্রেরণায় বছরে বছরে ওখানে অভিষেক-রজনীতে উপস্থিত হতেন। আপনার চেতন মন ঐ বিশ্বাসটা আঁকড়ে রেখেছিল—অবচেতনের অবদমিত কামেচ্ছাটাকে লুকোতে। আপনি জাগর মনকে বোঝাতেন, তত্ত্বের নির্দেশে একরাত্রের জন্য ভৈরব সাজছেন—আসলে আপনি ওখানে বছরে বছরে এসেছেন নারীদেহ উপভোগ করতে!

—মাদ্রাজে কি রেড-লাইট-এরিয়া ছিল না?

—ছিল। আছে। কিন্তু সেখানে রতিজ-রোগও আছে। আছে আপনার পরিচয়

জানাজানি হয়ে যাবার আশঙ্কা! নেই, অনায়াত কুমারী দেহের স্বাদ।

—ঠিক আছে, সূতনুকা। এ নিয়ে তর্ক করতে আসিনি আমি।

—ঠিক আছে, মিস্টার প্যাটেল, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। মনে হচ্ছে, আপনি একটা প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছেন। সেটা কী?

—একটা নয়। দুটো প্রস্তাব। প্রথম : আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও। ও তোমার কাছে একটা বোঝা। একটা অভিশাপ। আমার কাছে ও আকাঙ্ক্ষার ধন। ওকে মানুষ করব আমি। তুমি সেবে?

—আর দ্বিতীয় প্রস্তাবটা?

—সেটা জানান, প্রথমটার জবাব পেলে।

—সেটা জানান, দ্বিতীয় প্রস্তাবটা শুনলে।

—অল রাইট! দেবদিমকে তুমি মুক্তি দাও।

স্বস্তিত হয়ে গেল সূতনুকা। এবং মাদার। উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে, নিজেই অজাডেই। ঠিক সেই সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল চৌকাঠের উপর পঞ্চম প্রাণীটি। যে ঘরে প্রবেশ করেনি। ধাবার উপর মুখটা রেখে আধো ঘুমে শুয়েছিল এতক্ষণ। জ্যাক।

মাদার আসন গ্রহণ করলেন। জ্যাকও নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজল।

সূতনুকার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। বললে, তাকে আপনি চেনেন?

—ফর য়োর ইনফরমেশন, সে আজ মাস-তিনেক আমার সঙ্গেই থাকে। দিল্লিতে। আমারই বাড়িতে।

—আপনার সঙ্গে। কে? কে থাকে?

—আমার বড় ছেলে, দেবদিম।

সূতনুকার মুখটা সাদা হয়ে গেল। মাদার হয়তো আবার উঠে দাঁড়াতে চাইলেন। পারলেন না। তাঁর চরণ দুটি থরথর করে কাঁপছে।

জাস্টিস্ প্যাটেল একটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে বসলেন, তুমি 'অয়াদিপাউন্স' নাটকটা পড়েছ, সূতনুকা?

কেউ জবাব দিল না। প্রশ্নটিহুটা মিলিয়ে গেল নিরুত্তরতায়।

বিনায়ক প্যাটেল নিজেই ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, শাস্তি আমি নিজেই দিতে চেয়েছিলাম, নিজেই। একমুঠো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মৃত্যুও মুখ ফিরিয়ে রইল। জীবনে সবই পেয়েছি— অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মান! আবার কিছুই পাইনি। আমার স্ত্রীর অভিশাপে।এখন আবার সব তিল তিল করে ফিরে পাচ্ছি। দেব তার বাপকে ক্ষমা করেছে। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের শেষ দিনগুলো আনন্দধন করে তুলতে সে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। আমি তাকে সংসারী করতে চাই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা জানি, জানি, তোমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু তুমি কি পার দেবদাসী ৮০

ঐ ছেলটাকে কোলে নিয়ে আমার সেই ভাঙা সংসারে গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে? সেব একজন ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ারের ছেলে। সাংবাদিক হিসাবে অচিরেই সে সর্বভারতীয় সুনাম পাবে। তার জীবনে তুমি কাঁটা হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে? ঐ ছেলটাকে কোলে নিয়ে—যে তার সম্ভান এবং ছোটভাই?

এবারও কেউ কোন জবাব দিল না।

—কী? কিছু বল? না হয়, আপনিই কিছু বলুন মাদার?

পাশের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন বৃদ্ধ। বলেন, স্বীকার করছি, ভুল হয়েছে। হয়তো অন্যায়ও হয়েছে। কিন্তু জীবন তো থেমে থাকবে না? সমাধান কী? একটা অন্যায় হয়েছে বলেই আর একটাকে মেনে নেওয়া? দেবদিল্লের জীবনটা ছারখার করে দেওয়া? সারাটা জীবন তার সঙ্গীসাধীরা তার স্ত্রীর দিকে আঙুল তুলে বলবে—ঐ মিসেস দেবদিল্ল প্যাটেলের বাচ্চাটা তার স্বপ্নেরের ঔরসজাত।

—স্টপ ইট ব্লিজ! —গর্জ্ঞে ওঠেন মাদার।

বিনায়ক প্যাটেল তৎক্ষণাৎ বলেন, পারবেন সমাজকে ঐ কথা বলতে? পারবেন ধামিয়ে দিতে তাদের মুখরোচক আলোচনা?

মাদার মাথাটা নিচু করলেন।

প্যাটেল এবার সূতনুকার দিকে ফিরে বললেন, দুটো বিকল্প পথের একটা বেছে নাও! হয়, ঐ বাচ্চাটাকে আমাকে দিয়ে দাও—দেবদিল্লকে নিয়ে এমন দূর দেশে গিয়ে ঘর বাঁধ, যেখানে এসব আলোচনা হবার সম্ভাবনা নেই। অর এল্‌স্‌, সম্ভানকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাও। দেবদিল্ল যেন আর তোমাকে খুঁজে না পায়!

এবারও কেউ কোন জবাব দিল না।

অনেকক্ষণ পর মাদার বললেন, আপনার সাজেসশান কী?

—হ্যাঁ, আমি একটি বিকল্প তৃতীয় প্রস্তাবও নিয়ে এসেছি। একজন মধ্যপ্রাচ্যের ধনকুবের সূতনুকে নিয়ে আবুধাবী চলে যেতে রাজী আছেন। ওর সর্বাঙ্গ সোনায়ে মুড়ে দেবেন তিনি। সূতনুকা তাঁর হারেমে কঙ্কুবাইন হয়ে থাকবে!

মাদার জবাব দিতে পারলেন না। সূতনুকাও পারল না। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াল। দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগিয়ে এল বৃদ্ধের সামনে। স্থির দৃষ্টিতে পুরো বিশ-সেকেণ্ড সে তাকিয়ে রইল ঐ বৃদ্ধের দিকে। তারপর বিদ্যুৎ-চমকে তার ডানহাত গিয়ে পড়ল জাস্টিস বিনায়ক প্যাটেলের বামগণ্ডে!

সপাটে!

পাঁচ-আঙুলের দাগ ফুটে উঠল ওঁর গালে।

মাথার মধ্যে ঝন্‌ঝন করে উঠল বিনায়কের। প্রচণ্ড জোরে মেরেছে সূতনুকা। ক্রোধে জ্ঞান হারালেন তিনি। টেবিল থেকে তুলে নিলেন একটা রুলকাঠ। দাঁতে দাঁত চেপে

অশ্বফুটে একটা অশ্লীল ইংরেজি গাল পাড়লেন।

সুতনুকা ততক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়েছে। পিছিয়ে গেছে এক পা। বিনায়কের ডান হাতটা উঠেছে মাথার উপর।

মাদার আবার চিৎকার করে উঠলেন : স্টপ ইট!

এবার মাদারকেই একটা অশ্লীল গালাগাল করলেন বিনায়ক।

কিন্তু তাঁর শাসনদণ্ডটা নেমে এল না সুতনুকার মাথায়। মাদারের ঐ গর্জনেই নির্দেশ পেয়েছে জ্যাক। এক লাফে সে এসে দাঁড়িয়েছে প্যাটেল আর সুতনুকার মাঝখানে। তার দুটি থাবা বিনায়কের দুই কাঁধে। তার চোখে আগুন, তার গলায় একটা অশ্বফুট গর্জন। মাদারের পরবর্তী নির্দেশের প্রতীক্ষায় এখনও টুটিটা কামড়ে ধরেনি।

বিনায়ক ধরধর করে কাঁপছেন।

মাদার বললেন, লাঠিটা হাত থেকে ফেলে দিন।

বিনা বাক্যব্যয়ে রুলকাঠটা হস্তচ্যুত করলেন বিনায়ক।

—জ্যাক। কাম ব্যাক।

জ্যাক নেমে পড়ল। কিন্তু মাদারের কাছে ফিরে গেল না। অচেনা মানুষটার সামনে থাবা গেড়ে বসল। তার কণ্ঠে তখনও একটা অশ্বফুট গর্জন : গররর.....

মাদার বললেন, মিস্টার প্যাটেল, একটু আগে আপনি সুতনুকাকে প্রণয় করেছিলেন, সে ‘অয়াদিপাউস’ পড়েছে কিনা। এখন আপনি আমাকে দয়া করে জানানবেন কি—আপনি ‘দ্য হোলি বাইবেল’ নামে একখানি বই পড়েছেন কি?

বিনায়ক প্যাটেল নিরুত্তর। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ঐ অ্যালসেশিয়ানটার দিকে।

—আপনি নিশ্চয়ই ‘অয়াদিপাউস’ পড়েছেন। আপনি জানেন, রাজা অয়াদিপাউস নিজের দুই চোখ নিজে হাতে উপড়ে ফেলেছিলেন—মাইন্ডযু—দুটো চোখ, একটা নয়।

বিনায়ক এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পেয়েছেন, এসব কী বলছেন আপনি?

—বলছি, আপনি দু-দুটি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন চার্চের ভিতরে—আমার এবং আমার মেয়ের সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে—মাইন্ডযু—দুটো অশ্লীল গালাগাল, একটা নয়। এগ্রীড? এটা ইয়েলান্সা-মন্দির নয়, চার্চ! এখানে আমার বিচার আপনাকে মানতে হবে। এগ্রীড? যু আর দ্য কন্‌ভিক্ট! এগ্রীড?

বিনায়ক উঠে দাঁড়াতে চান।

—সিট ডাউন!—গর্জে ওঠেন মাদার।

তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসে জ্যাক। বিনায়ক বসে পড়েন আবার।

—জীবনভর বিচারকের ভূমিকাটাই অভিনয় করে গেছেন মিস্টার প্যাটেল। আসামীর ভূমিকাটা আজ পালন করার দিন এসেছে! অল রাইট! আ’ল প্রনাউস দ্য ডাব্লিউ নাউ! সুতনুকা আপনাকে প্রথম যে চড়টা মারে সেটা ‘রিফ্লেক্স অ্যাকশন’—না ভেবে-চিন্তে! দেবদাসী ৮২

ঐ ঘৃণিত প্রস্তাবটা শুনে আমারও সে ইচ্ছা জেগেছিল! সেটা বিচার নয়। এবার ভেবে-
চিন্তে বিচার করে রায় দিচ্ছি। শুনুন :

বিনায়ক দরদর করে ঘামছেন!

—খীসাস্ বলেছেন : কেউ তোমাকে এক গালে চড় মারলে তুমি দ্বিতীয় গালটা
বাড়িয়ে দেবে। এই আপনার শাস্তি। দিন্! ও-গালটা বাড়িয়ে দিন।

বিনায়ক প্রস্তরমূর্তি!

মাদার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন সুতনুকার দিকে। বললেন : তুমি ষঁর ডান-গালে আর
একটা চড় মারো সু!

বিনায়ক প্যাটেল নড়েচড়ে বসলেন। উঠে দাঁড়াবার সাহস হল না তাঁর। কারণ
মাদারকে উঠে দাঁড়াতে দেখে জ্যাকও উঠে দাঁড়িয়েছে।

সুতনুকা অনেক আগেই গিয়ে বসেছিল তার টুলে। সেও প্রস্তরমূর্তি।

মাদার গর্জে উঠলেন : ক্যারি আউট মাই অর্ডার্স সু! ইট্‌স্ এ কম্যান্ড!

সুতনুকা উঠে দাঁড়াল। ধীরপদে এগিয়ে এল তার জীবনের অভিশাপের সম্মুখে।
সে কিন্তু যন্ত্রের মতো কাজ করছে। ঘাতক যেমন যন্ত্রের মতো ফাঁসির দড়িটা লটকিয়ে
দেয় আসামীর গলায়।

বাঁ-হাতটা তুলে সজোরে চপেটাঘাত করল বিনায়কের ও-গালে।

—যু মে নাউ লীভ আস্ অ্যালোন, মি-লর্ড! —শাস্ত সমাহিত কণ্ঠে বললেন মাদার।



—মে আই কাম ইন প্লীজ?

সুইং-ডোর-এর এ-পাশ থেকে প্রণয় করল সূতনুকা।
তার হাতে একটা খাম।

—ইয়েস, ডু কাম ইন, মাই চাইল্ড! এস!

সুইং-ডোর ঠেলে মাদার সুপিরিয়রের অফিস-ঘরে
প্রবেশ করল এবার। তাঁর অনুমতি পেয়ে বসল ভিজিটার্স
চেয়ারে। ঘরে তিনি একা। পায়ের কাছে অবশ্য জ্যাক
নিদ্রাগত। নিঃশব্দে বাড়িয়ে ধরল খামটা। মাদার সেটা হাত
বাড়িয়ে নিলেন। দেখে বললেন, এ কী? খামটা বন্ধ
করনি?

—না। আপনি পড়ুন আগে।

—না-না-না। তা হয় না। আমি পড়তে পারি না তোমার চিঠি।

—পারেন। আমি অনুরোধ করছি ; আমি মিনতি করছি ; মাদার—

আর ইতস্তত করলেন না। খামের গর্ভ থেকে চিঠিখানা বার করে পড়তে থাকেন।

সূতনুকা টেনে নিল কালো-মলাটের বইটা। কিং-জেমস্ ভার্শন ; দ্য হোলি বাইবেল।

যে কোনো একটা পাতা খুলে পড়তে থাকেন মনে মনে :

"Hear my prayer, O Lord.

and let my cry come unto thee.

Hide not thy face from me

in the day when I am in trouble ;

incline thine ear unto me :

in the day when I call, answer me speedily "

—এসব কী লিখেছ তুমি? এ তো মিথ্যা। এ তো অসত্য! এ তো...

বাইবেলটা বন্ধ করে এবার গুঁর চোখে-চোখে তাকিয়ে বলল, আপনি আমাকে
ব্যাপ্টিজ করুন মাদার! আমাকে 'নানারি'-তে ভর্তি করে নিন! খোকনকে রেখে যাব
আপনার কাছে। আমাকে কোন দূর-সুদূর দেশে পাঠিয়ে দিন প্রীচ করতে!
যেখানে....যেখানে, ও আমার নাগাল পাবে না!

—কিন্তু কেমন করে তোমাকে দীক্ষা দেব সু? তুমি যে আজও মিথ্যার সঙ্গে আপোস
করছ। তুমি জান না—মিথ্যা কখনও মঙ্গলকারী হয় না? জান না, স্বর্গটাই ঈশ্বরের ;
দেবদাসী ৮৪

আর মিথ্যার নরকটা শয়তানের?

—না মাদার! আমি তা আজও জানি না। আপনি যে এখনও আমাকে ব্যাপ্টাইজ করেননি। আমি যে আজও হিন্দু। আমি এখনও বিশ্বাস করি : স্বর্গ-নরক, আলো-অন্ধকার, সত্য-মিথ্যা—সব—সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি! আমি বিশ্বাস করি, শয়তান যদি থাকে তবে সে স্বয়ম্ভুনয়, সেও ঈশ্বরেরই কীর্তি! তারও অনিবার্য ভূমিকা আছে এই সৃষ্টিতে।

নিষ্ঠাবান খ্রীস্টান 'damned' শব্দটা উচ্চারণ করেন না। উত্তেজনার মুখে বলে ফেলেন 'd d'!

—তাই বলে তুমি এমন জলজ্যাস্ত 'ডি-ড্যাশ-ডি' মিথ্যা কথাটা লিখবে? তুমি দেবদিককে প্রত্যাখ্যান করছ ঐশ্বরের লোভে! স্বৈচ্ছায় চলে যাচ্ছ মধ্যপ্রাচ্যে—একজন ধনকুবের মুসলমানের হারেমে রক্ষিতার পরিচয়ে!

—আমাকে ঘৃণা করতে না পারলে সে তো আমাকে ভালোতে পারবে না, মাদার। তার ঘৃণার উপাদান তো আমাকেই যোগাতে হবে!

মাদার থমকে গেলেন। 'লাভ দাই নেবার' মস্ত্রের দীক্ষিতা তিনি। 'ঘৃণা'-কে কেউ পূজার অর্ঘ্য করতে পারে এটা তাঁর জানা ছিল না। তবু বললেন, তা হলেও এ তো মিথ্যা!

—হ্যাঁ, মিথ্যা! তাই তো বলছিলাম—ঈশ্বর 'মিথ্যা' সৃষ্টি করবেন কেন? 'ঘৃণা'-র জন্ম দেবেন কেন? এই সৃষ্টিতত্ত্বে তাদেরও নিশ্চয়ই কিছু ভূমিকা আছে। জনকল্যাণকারী ভূমিকা!

মাদার চিঠির বাকি অংশটার উপর চোখ বুলিয়ে যান। মিথ্যার কুহক দিয়ে সূতনুকা রচনা করেছে এক অলীক সাতমহলা প্রাসাদ। দেবদাসীর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে তার নাকি জীবনের মূল্যবোধটাই পালটে গেছে, দৃষ্টিভঙ্গিটা অনিবার্যভাবে বদলে গেছে। কুলবধুর চার-দেয়ালের চতুঃসীমায় তার আত্মা ইঁপিয়ে উঠবে। তার একমুখী প্রেম অভ্যাসে আপনা থেকেই হয়ে গেছে : বহুধা! সে জগৎটাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতে চায়! অলঙ্কার-ঐশ্বর্য-ভোগবিলাসের স্রোতে অবগাহনের জন্য সে আজ লালায়িত। 'কুইন অব শেবা'র মতো, ক্রিওপেট্রার মতো, নূরজাহাঁর মতো! তার রক্তের মধ্যে যে এই ঝড়ের মাতন ছিল, এটা সে বুঝতে পারেনি এতদিন, বুঝেছে গত দু-বছরে—এই নিরামিষ গীর্জার বাতাবরণে। রুক্ষিণী গেছে বেলুচিস্তানে—ওর অন্তরাখ্যা চাইছে তার উপর টেকা দিতে। সুযোগও পেয়ে গেল একটা। ও হতে চলেছে সুদূর প্রাচ্যের এক ধনকুবের আরব শেখ-এর হারেমের মধ্যমণি। নাদির শাহ-র লুট করা মণি-মাণিক্যও নাকি আছে তাঁর তোষাখানায়!

দেবদিক যেন ওকে ক্ষমা করে।

মাদার যখন ওর দিকে চোখ তুলে তাকালেন তখন তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা। এতক্ষণে

তিনি সূতনুকার আঁকা ঐ নীরঙ্ক অমারাত্রির নৈশাকাশে কোথায় যেন খুঁজে পেয়েছেন এক অদৃশ্য ‘বেথেলহেম’-এর তারার আলো। স্বীকার করলেন মনে মনে : শয়তান যদি থাকে তবে সেও ঈশ্বরের সৃষ্টি। মিথ্যারও প্রয়োজন আছে সৃষ্টিতে।

বললেন, আজ সান্-ডে, সাবাথ। কাল চিঠিটা পোস্ট করে দেব।

—না। ওটা দিন। জি. পি. ও খোলা আছে। আমি এখনই ওটা ডাকে দেব।

মাদার বিস্মিত। বলেন, কেন সু? এত তাড়াতাড়ি কিসের?

—আমিও তো রক্ত মাংসের জীব, মাদার। রাত পোহালে যদি ‘ঘৃণা’র বদলে ‘প্রেম’টাকেই বড় বলে মনে হয়।

এবার আর মাদারের দিকে তাকাতে পারল না। চিঠিখানা ছিনিয়ে নিয়ে, সুইং-ডোর ঠেলে বেরিয়ে গেল ছুটে।

সুইং ডোর-এর পাল্লা দুটো প্রচণ্ডভাবে দুলতে থাকে। দুটো পাল্লাই যেন মাথা ঝুঁড়ছে, আপ্সাচ্ছে। পরস্পরের স্পর্শ পাওয়ার প্রত্যাশায়। কিন্তু তারা পরস্পরের নাগাল পেল না। মাঝখানে অনিবার্য এক-আঁচুলের ব্যবধান।

দুলতে দুলতে ক্লান্ত হয়ে কাঠের পাল্লা দুটো একসময়ে থেমে গেল।

মাদার সেদিকেই তাকিয়েছিলেন। দেখছিলেন না কিন্তু। তিনি আনমনা। কী যেন ভাবছেন। কী ভাবছেন তিনি? জানি না।

বোধকরি তিনি নতুন করে ভাবছিলেন সেই পুরানো প্রশ্নটার জবাব। সেই যে প্রশ্নটা ভারতীয় সভ্যতায় দেবদাসী-প্রথার প্রথম উল্লেখ করে নিরুন্তর প্রতীক্ষায় আজ বিশ-শতাব্দী ধরে ভেবে চলেছে যোগীমারা গুহার উপর পাষাণ ফলকটা।

সম্রাট অশোকের আমলে মাগধী-প্রাকৃতে লেখা একটি পংক্তি :

‘সূতনুকা নাম দেবদাসিকী তং কাম্যসিখ বালানশেয়ে দেবদিত্তে নাম লুপদকথে।’

সূতনুকা নামে এক দেবদাসী নাকি দেবদিত্ত নামের এক রূপদক্ষকে ভালবেসেছিল।

পরের ছন্দে লিপিকার নিজেই বিস্ময় প্রকাশ করে বিশ-শতাব্দী পূর্বে প্রশ্নটা পেশ করেছিলেন : অমন একটি মেয়ে কেমন করে পড়ল এমন গভীর—সুগভীর প্রেমে?